লোকায়ত বাংলা

সুনীল চক্রবর্তী

কল্যাণী প্রকাশন
৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রস্তাবনা

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার নানা প্রবন্ধকে ভিত্তি করেই এ গ্রন্থ প্রণীত। এ গ্রন্থে বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ উপস্থাপিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের দাবীও আমি করছি না। লোক-সংস্কৃতির উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক বিকাশের দিকে নজর রেখে লোকসঙ্গীত, লোকচর্যা ও লোকচিত্রকলা সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপনার তাগিদে এ গ্রন্থ প্রণয়ন।

বাংলা ভাষায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার পরিমাণ ও পরিসর নেহাৎ নগণ্য নয়। কিন্তু লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে এ জাতীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিসম্মত কোন আলোচনা বোধকরি এ যাবৎ রচিত হয় নি। তাই এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাকে নিজের পথ কেটে অগ্রসর হতে হয়েছে। কতিপয় প্রয়োজনীয় পরিভাষাও আমাকে তৈরি করতে হয়েছে। তার উপযোগীতা সুধীজনের বিচার্য। যদি এ গ্রন্থ সুধী পাঠক ও সংস্কৃতিকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, তা হলেই আমি কৃতার্থ।

এ গ্রন্থ প্রকাশে নানাবিধ সহায়তা, পরামর্শ ও ভূমিকার জন্যে আমি ইংরেজী মাসিক পত্রদ্বয় "ফোকলোর" এবং "হিউম্যান ইভেন্টস্"-এর সম্পাদক ও লোকসংস্কৃতি-গবেষক শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রচ্ছদের বর্ণলিপিকার বন্ধুবর শিল্পী শ্রীসজল রায় আমার ধন্যবাদার্হ। নবশক্তি প্রেসের ম্যানেজার শ্রীসুরতোষ দত্ত ও কর্মীবৃন্দ যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে মুদ্রণ কার্য সমাপ্ত করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ। যে সব সাময়িকপত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পূর্বেই গ্রন্থের নানা পরিচ্ছেদ প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছিলেন তাদের সম্পাদকদের মামুলি ধন্যবাদ দিয়ে বন্ধুত্বের অবমাননা করবো না।

সুনীল চক্রবর্তী

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম. এ. পরীক্ষায় লোকবৃত্ত (বা Folklore)-এর একটি শাখা লোকসাহিত্য বিশেষ পঠনীয় বিষয় বলিয়া স্বীকৃত। নৃতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি পরীক্ষাতেও লোকবৃত্তের বিভিন্ন শাখার অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় লোকবৃত্তকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিশ্বভারতী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে লোকবৃত্ত অধ্যয়নে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিসংক্রান্ত শিক্ষাদানের জন্য গঠিত অথবা সেই বিষয়ের প্রতি বিশেষ ঝোঁকবিশিষ্ট। লোকবৃত্তের সাহায্য ব্যতীত কৃষি বিষয়ক কোন শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। কৃষককে জানিতে হইলে কৃষক সমাজে প্রচলিত গল্প, কথা, কাহিনী, আচার-আচরণ, নাচ, গান, রীতি-নীতি, পূজার্চনাদিও জানিতে হইবে। কৃষককে না জানিয়া, কৃষকের সমাজ ও সংসার সম্পর্কে অনবহিত থাকিয়া, কৃষি সম্পর্কিত কোন শিক্ষা অনেকটা গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত। তাহাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংগঠনসমূহ লোকবৃত্তের নানাদিক লইয়া ব্যাপক গবেষণার সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও এই বিষয় সম্পর্কে সচেতন। এমতাবস্থায় বর্তমান গ্রন্থখানি শুধু সময়োচিত হয় নাই, ছাত্র শিক্ষক ও গবেষকদের প্রয়োজন-উপযোগীও হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় লোকবৃত্তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা লইয়া বর্তমানে পাক-ভারতে যথেষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু, মারক্সীয় সমাজদর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ বোধহয় অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। অথচ লোকবৃত্তের অধ্যয়নের ও মারক্সবাদী শিক্ষার প্রসার হইয়াছে, আলোচনা সমুন্নত, তীক্ষ্ণ ও মার্জিত হইয়া চলিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থখানিকে

ভূমিকা

মারক্সীয় সমাজ দর্শনের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ অথবা সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিবার কথা বলিতেছি না। কিন্তু প্রগতিশীল সামাজিক ইতিহাস-চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা লোকবৃত্ত মূল্যায়নের একটি অভাব পূর্ণ করিবার নিশানা দেখাইয়াছে। এইখানেই ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। এইখানেই ইহার উপযোগিতা।

লোকবৃত্তের সংজ্ঞা, অবয়ব, বিস্তার, পরিধি ও আধার ইত্যাদি লইয়া পণ্ডিত মহলে মতামতের অন্ত নাই। এমন্ কি ইংরেজী 'ফোকলোর' শব্দের ভারতীয় প্রতিশব্দ লইয়াও মতানৈক্য বিদ্যমান। লেখক বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির মতবাদ লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কাঠখোট্টা পাণ্ডিত্য না ফলাইয়া, নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও দার্শনিক মতবাদকে ভিত্তি করিয়াই প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। তবুও ইহা না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে যে বিজ্ঞ পাঠক লোকসংস্কৃতি পরিচ্ছেদে সংস্কৃতির আলোচনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করিবেন, তেমনি লোকসঙ্গীতের আলোচনায় সংগীত বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনায় অতৃপ্ত হইবেন, যেমন লোকচর্যা এবং লোকচিত্রকলা-র বিষয় সম্পর্কিত আলোচনায় হয়ত তাঁহাদের পিপাসা চরিতার্থ হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে মামুলী আলোচনার বদলে ইহা একটি বিশেষ দর্শনভিত্তিক আলোচনা গ্রন্থ। এই আলোচনায় জনসাধারণের কথা তাঁহাদের নিজস্ব দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য গ্রন্থখানিকে যে চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া শীর্ষনাম এবং প্রত্যেকটি শীর্ষনামের সহিত অনুশীর্ষ ও নানা টীকা টিপ্পনী যুক্ত করিয়া দিয়া গ্রন্থকার স্বীয় পরিশ্রমের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন।

গ্রন্থকার শ্রীসুনীল চক্রবর্তী কাটোয়া কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। ছাত্রাবস্থা হইতে তিনি এক বিশেষ দার্শনিক মতবাদে দীক্ষিত ও আস্থাবান। সুদীর্ঘদিনের চিন্তাভাবনা ও অধ্যয়নের পর তিনি বর্তমান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বহুপ্রকার পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা ও বিবরণ প্রযোজিত হইয়াছে। তাঁহার ব্যবহৃত পরিভাষা, সংজ্ঞাদি এবং তাঁহার প্রচারিত মতবাদ ও সার্বিক বক্তব্যের সঙ্গে সকলেই সহমত হইবেন এ আশা দুরাশা ও অসমীচীন। তাঁহার বহু বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত নই। কিন্তু গ্রন্থকার এমন মুন্সীয়ানার সহিত তাঁহার বক্তব্য তুলিয়া ধরিয়াছেন যাহা মতানৈক্য সত্ত্বেও মনোযোগ সহকারে পড়িয়া যাইতে পাঠককে বাধ্য করে। তাঁহার বক্তব্য জোড়ালও বটে। লোকবৃত্তের প্রত্যেকটি ছাত্র-অধ্যাপক-গবেষকদের কাছে এই বক্তব্য

তুলিয়া ধরিলে সুনীলবাবুর সঙ্গে যাঁহারা সহমত তাঁহারা তৃপ্তি পাইবেন, তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের মতবিরোধ দেখা দিবে তাঁহারাও যথেষ্ট চিন্তাভাবনার অবকাশ পাইবেন। উৎসাহী ও একনিষ্ঠ পাঠক ব্যতীত অন্য যে সকল ব্যক্তির এই বিষয়ে আগ্রহ আছে, বিশেষত প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও সমাজবাদের প্রতি আস্থাবান ছাত্র-যুবসমাজ, তাঁহারা যদি কৌতূহল বশেও গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিয়া বসেন তবে বঞ্চিত হইবেন না একথা জোর করিয়াই বলিতে পারি। সেই কারণেই বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশ ব্যবস্থা এবং আলোচা ভূমিকার অবতারণা। বলাবাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ হইতে লোকবৃত্তের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা না গেলে লোকবৃত্তকে সম্যক উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য বলিয়া অনেকেই মনে করেন। ইতিপূর্বে মারক্স্‌বাদী দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সমাজবিদ্যার নানা গ্রন্থে লোকবৃত্ত মূল্যায়নের যে সমস্ত প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান থাকিবার দরুণ বর্তমান গ্রন্থের ন্যায় সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তারে ও দৃষ্টি আকর্ষণে অপারগ। তথাপি একথা না বলিয়া পারিতেছি না যে মারক্সীয় বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে রচিত এই গ্রন্থের প্রতিটি ব্যাখ্যার সঠিকতা নিরূপণের সম্যক্ অধিকারী আমি নই। মারক্সীয় পণ্ডিতগণই সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দানে সক্ষম বলিয়া মনে করি।

আমি লোকবৃত্ত অনুরাগী হওয়ায় লোকবৃত্ত বিষয়ক কোন গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি পাইলেই আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি। শ্রীসুনীল চক্রবর্তী তাঁহার 'লোকায়ত বাংলা' গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি যেদিন আমাকে পড়িতে দিলেন সেইদিনই তাহা পড়িয়া অনুভব করিলাম যে গ্রন্থখানি বাংলার লোকবৃত্ত অধ্যয়নের একটি বিশেষ দিকের অসম্পূর্ণতা কিয়দংশ দূর করিতে সক্ষম। বাংলার লোকবৃত্তের প্রগতি ও বস্তুবাদী আলোচনার এমন সরল ও সুলিখিত গ্রন্থ বড় বেশী প্রকাশিত হয় নাই। সমাজ ও ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার লোকবৃত্তের এই পরিচয় ছাত্র শিক্ষক ও জনসাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়াই ভরসা করি। এই বইখানির সাহায্যে পাঠক মারক্স্‌বাদী দৃষ্টিকোণ হইতে লোকবৃত্তের বিচার করিতে পারিবেন, স্বদেশ ও স্বজাতিকে ঐ আলোকে দেখিতে পাইবেন, লোকবৃত্তের উপর বস্তুবাদী দৃষ্টিসম্মত একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার জন্য পণ্ডিত গবেষকদের উৎসাহিত করিতে পারিবেন। এই উৎসাহ ব্যতীত "পূর্ববঙ্গ গীতিকা", "বাংলা প্রবাদ", "Folk Literature of Bengal" "Obscure Religious Cult" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইত না, এমন

ভূমিকা

কি হয় তো "Govinda Samanta or Bengal Peasant Life" বা Folktales of Bengal"-ও অপ্রকাশিতই থাকিয়া যাইতো। কাজে কাজেই গ্রন্থখানি সকলের কাছে আদরণীয় হইলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ইহার অন্তর্নিবেশ ঘটিলে গ্রন্থকারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে অনুরাগী অন্যান্যেরাও উৎসাহিত হইবেন, উপকৃত হইবেন। পাঠক এবং অনুরাগীরাও তাঁহাদের কৃত্য সম্পাদন করিয়া তৃপ্তি পাইবেন। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে তাঁহাদের এবং বাংলার সংস্কৃতিবান জনসাধারণ কর্তৃক ইহা সমাদৃত হইলে গ্রন্থ রচনার পরিশ্রম যে সার্থক হইবে তাহা উল্লেখের দাবী রাখে না।

আমি সানন্দে ভূমিকা লিখিয়া বইখানি জনসাধারণের গোচরে উপস্থিত করিয়া ধন্য হইলাম।

ইতি

শঙ্কর সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

লোকসংস্কৃতি

ফোকলোর: সংজ্ঞা ও স্বরূপ

'ফোকলোর' শব্দটির প্রথম প্রবর্তন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, প্রবর্তক ডবলু. জে. টমস্। প্রবর্তকের অভিপ্রায় অনুসারে শব্দটির তদানীন্তন অর্থ হল 'জনপ্রিয় পুরাতত্ত্ব' কিংবা 'জনপ্রিয় সাহিত্য'।[১] কালক্রমে 'ফোকলোর' চর্চার ব্যাপ্তি বিস্তৃত হল, ফলে 'ফোকলোরে'র সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কিত অনেক আলোচনা ও বহুবিধ বক্তব্যের আত্মপ্রকাশ ঘটল। অধিকন্তু অর্থ প্রসারের ফলে 'ফোকলোরে'র পরিধি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হল। টমসের অভিপ্রেত অর্থানুগত্যে 'ফোকলোর' সুদূর অতীতের লোক সমাজে প্রচলিত আচার-আচরণ, রীতি-রেওয়াজ ও জনপ্রিয় সংস্কারের সীমায় সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থ প্রসারের ফলে ঐতিহ্য, লোকশ্রুতি, কিংবদন্তী, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোকায়ত ছড়া, লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কার, লোকাচার, লোকনাট্য, লোকগীতি, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকগাথা, লোকচর্যা, লোক-চিত্রকলা, লোকশিল্প, লোক-উৎসব, লোকায়ত অনুষ্ঠান ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় 'ফোকলোরে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ম্যারিয়া লীচ্ সম্পাদিত 'স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশনারি অব ফোকলোর, মিথলিজ অ্যাণ্ড লিজেণ্ড'[২] গ্রন্থে কতিপয় প্রখ্যাত 'ফোকলোর'-বিশেষজ্ঞের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এ সব বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এমন অনেক বিষয় ইদানীং 'ফোকলোরে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা প্রাথমিক পর্যায়ে 'ফোকলোর'-বহির্ভূত ছিল।[৩] 'ফোকলোরে'র এই অর্থ প্রসারের ঘটনা সম্পর্কে আজ আর বিতর্কের অবকাশ নেই।

'It has, however, acquired a variety of meanings. In Fr. and Scand. esp., folklore is employed to embrace such matters as traditional house forms, agricultural practices, textile

methods and other aspects of material culture usually assigned to anthropology. The term, in Eng., is normally confined to the spoken written traditions of a people, to traditional aesthetic expressions. Even within this definition, folklore approaches anthropology at many points, both, in subject matter and in method.

Midway between purely anthropological studies and folklore lie such activites as feasts and ceremonies, folk dances, folk. dramas. All ceremonies possess a considerable amount of traditional aesthetic expression, in the form of tales, didactic speeches, songs. Similarly, sand paintings, such as those of the Navaho, are handed down from the past and are thus properly a part of tribal folklore. The text of a traditional folk drama is undoubtedly folklore.

There would seem to be no disagreement about its use to include all kinds of folksong, folktales, superstitions, local legends, proverbs, riddles.'[৪]

ম্যারিয়া লীচ্ উপস্থাপিত 'ফোকলোর'-বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য ও লোকজীবনের বহুবিধ বিষয়কে আলোচ্য শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে। 'ফোকলোবে'র এ সব সংজ্ঞাকার কর্তৃক নির্দিষ্ট বিষয়ের সারসংক্ষেপ অনেকটা নিম্নরূপ[৫]।

সংজ্ঞাকার	'ফোকলোর-র অন্তর্গত বিষয়
১. জোনস্ ব্যালিস্	ঐতিহ্যানুসারী লৌকিক সৃষ্টি, সংস্কার, রীতিনীতি এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান।
২. এম. ব্যারবীন	বসতি-প্রথা, বিধিনিষেধ, ভাস্কর্য, উদ্ভট আখ্যান, ধাতুকর্ম, বয়নরীতি, প্রাচীন গার্হস্থ্য চিত্র-শিল্পকলা, প্রাচীন সামাজিক কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত লিখিত দলিল ও উপকরণসমূহ, প্রবাদ-প্রবচন, উপকথা, হেঁয়ালী, লোককথা, ধাঁধা, নাচ, গান, ইত্যাদি।

৩. ডবলু. সি. ব্যাসকম	লোকশ্রুতি, কিংবদন্তী. লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোকায়ত অনুশীলনের নানাবিধ উপাদান-উপকরণ।
৪. বি. এ. বটকিন	লোকশ্রুতি, কিংবদন্তী, নানাস্তরের জীবন-ঘনিষ্ঠ গান ও নানা প্রসঙ্গ।
৫. এ. এম. এস্‌পিনোজা	আদিম ও অশিক্ষিত জনসাধারণের, এমন কি সভ্য সমাজের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, রীতিনীতি, প্রবাদ-প্রবচন, লোকশ্রুতি, লোককথা, লোকগীতি, ধাঁধা, ইন্দ্রজাল, উৎসব-অনুষ্ঠান।
৬. জি. এম. ফস্টার	লোককথা, লৌকিক আখ্যায়িকা, লোকশ্রুতি, লোকগীতি, লোকবিশ্বাস, ইত্যাদি।
৭. টি. এইচ. গ্যাস্টার	জনপ্রিয় ঐতিহ্য, সচেতন বা অচেতন ভাবে সংরক্ষিত লোক-বিশ্বাস, লোককথা ইত্যাদি।
৮. জি. পি. ক্যুরাথ	আদিম ধর্মীয় আচরণ, কিংবদন্তী, লোকগীতি, লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য, লোকবিশ্বাস, লোককথা, লোকক্রীড়া, ইত্যাদি।
৯. এম. লীচ	অদ্বৈত প্রাকৃতিক বেষ্টনী ও ভাবাবেগে সংহত সমজাতীয় সহজ সরল মানুষের পুঞ্জীভূত জ্ঞান।
১০. আর. ডি. জেম্‌সন	সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিশেষ উপাদান-উপকরণ, পারিবারিক পরিহাস, কিংবদন্তী ইত্যাদি।
১১. কে. ল্যুওনেল	অলিখিত বর্ণনা, কৃষক সমাজের নানাবিধ রীতিনীতি ইত্যাদি।
১২. জে. এল. মিশ	আদিম বিশ্বাস, রীতিনীতি, লোকচার, ঐতিহ্য, লোককথা, লোকশ্রুতি, কিংবদন্তী, আচার-অনুষ্ঠান, লোকক্রীড়া, লোকগীতি, লোকচিত্রকলা, লোকশিল্প, লোকানৃত্য ইত্যাদি।
১৩. সি. এফ. পটার	লোকবিশ্বাস, রীতিনীতি, লোকাচার, আদিম আদর্শ ইত্যাদি।

১৪. এ. টেলর — প্রবাদ-প্রবচন, লোকগাথা, উপকথা, লোককথা, রূপকথা, কিংবদন্তী, লোকগীতি, ঘুমপাড়ানী গান, জাদু,[১] লোকনাট্য ; জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, রোগ, আঘাত, কৃষি ইত্যাদি সংক্রান্ত লোকাচার, হাতিয়ার ও পোষাক-পরিচ্ছদের আকার-আকৃতি ও ব্যবহার প্রণালী, গ্রাম ও গৃহ প্রকল্পের আদর্শ ইত্যাদি।

১৫. ই. ডবল্যু. ভীজেলিন — সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিষয়বস্তু সমূহ, ঐতিহ্য, গদ্যে ও পদ্যে রচিত সামগ্রী, সামাজিক-ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকাচার, ঐতিহ্যানুগত চিত্রকলা ও শিল্প, প্রাচীন ও অলিখিত সাহিত্য : লৌকিক আখ্যান, লোককথা, নাটকীয় সংলাপ, প্রার্থনামন্ত্র, লোকগীতি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি।

১৬. এস. টম্প্সন — লোকাচার, লোক বিশ্বাস, কিংবদন্তী, কৃষি, গার্হস্থ্য ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি।

১৭. এ. এইচ. ক্র্যাপে — লৌকিক আখ্যায়িকা, লোকাচার, লোক বিশ্বাস, ইন্দ্রজাল, লোকচর্যা ইত্যাদি।

১৮. শঙ্কর সেনগুপ্ত — লোকশ্রুতি, কিংবদন্তী, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ছড়া, লোক-বিশ্বাস, লোক সংস্কার, লোকাচার, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকগাথা, লোকচর্যা, লৌকিক দেবদেবী, লৌকিক রীতিনীতি, লোকধর্ম, আচার, আচরণ, লোক-উৎসব, ইন্দ্রজাল, লোকচিত্রকলা, লোকশিল্প ইত্যাদি।[৬]

১৯. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য — লৌকিক ধর্ম ও লোকাচার।[৭]

'ফোকলোরে'র অন্তর্গত এহেন বহুবিচিত্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে নানাবিধ সংজ্ঞা উদ্ভাবিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 'ফোকলোর' বিজ্ঞান ; কারো

কারো মতানুসারে, ফোকলোর সাহিত্য আবার অনেকের সিদ্ধান্ত : ফোকলোর হল সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মিশ্রন। উদাহরণস্বরূপ :

১। জোন্‌স্ ব্যালিসের মতানুসারে 'folklore is not a science of a folk, but is traditional folk science or folk poetry.[৮]

২. ডবলু. সি. ব্যাসকমের সিদ্ধান্ত , folklore is a verbal art.[৯]

৩. এ. এম. এস্‌পিনোজার মতে ফোকলোর সমাজ বিজ্ঞান।[১০]

৪. জি. এম. ফাস্টার বলেছেন : ফোকলোর লোকসমাজের অলিখিত সাহিত্য।[১১]

৫. এম. জে. হার্সকোভিট্‌স্ ঘোষণা করেছেন : folklore is a popular literary form, and consists of unwritten literature of any group.[১২]

৬. আর. ডি. জেম্‌সনের বক্তব্য : ফোকলোর সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের অন্যতম শাখা।[১৩]

৭. জি. পি. ক্যুরাথ 'ফোকলোরকে বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করেছেন।[১৪]

৮. ডঃ শ্যামচাঁদ মুখার্জীর অভিমত : Folklore is both a science and an art.[১৫]

৯. ই.এস. হার্টল্যাণ্ডের সংজ্ঞা অনুসারে ফোকলোর হল : 'anthropology dealing with the psychological phenomena of uncivilized man'.[১৬]

১০. টমস্ যখন প্রথম 'ফোকলোর' শব্দটি উদ্ভাবন করেছিলেন তখন তিনি তার সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছিলেন, লোক (folk) সম্পর্কিত জ্ঞান (learning)। লোক বলতে তিনি অসাক্ষর কৃষক সমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন।[১৭]

১১. ফ্যুঙ্ক এ্যণ্ড ওয়্যাগন্যালের 'স্ট্যাণ্ডার্ড ডিকশনারি অব ফোকলোর' গ্রন্থে উপস্থাপিত বিশটি সংজ্ঞার একটি অনুসারে ফোকলোর হল, 'the anthropology of peasants.[১৮]

১২. ডঃ তুলাল চৌধুরী বলেছেন : 'ফোকলোর' বিজ্ঞান ও মানবতা বিষয়ের যোগফল।[১৯]

১৩. শ্রীঅরুণকুমার রায় 'ফোকলোরে'র যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন তা হল : 'যে সজীব উপাদানসমূহ মানবসভ্যতার উষাকালে যৌথ প্রয়াসে সর্বজনগ্রাহ্য উপসৌধগুলির ভিত্তিভূমি রচনায় সহায়তা করেছিল এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজ

অতিক্রম করে এবং নব অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতের এক উচ্চতর সর্বজনগ্রাহ্য সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে সঞ্চয়রূপে দেখা দেয় তাকেই লোকায়ন (folklore) বলে'।[২০]

১৪. শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন: Folk অর্থাৎ 'লোক'কে বৃত্ত করে যে 'জ্ঞান' (Lore) তাই Folklore বা লোকবৃত্ত।[২১] অন্যত্র তিনি বলেছেন: What in fact is folklore? I do not myself really know. This have been written to demonstrate that it is This or That or Not the Other Thing. I do not even know whether folklore is to be described as an art, or as a seience; but it is at least abundant clear that folklore is increasingly dependent on a multitude of science and is itself increasingly adopting the methodology of natural science. As a science it is a synthetic process and as an art, it is an integration of scientifically observed phenomena relating to man; it is still a synthesis. This is not a difinition but merely a description and incomplete at that.[২২] স্যার মর্টিমার হুইলার Archaeology বা পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান না কলাশাস্ত্র প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়েও এবংবিধ অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। তাঁর Archaeology form the Earth গ্রন্থে তিনি বলেছেন: We may be content to see that the grass is green without understanding the mysteries of chlorophyll or attempting to distinguish too cleverly between botany and chemistry; we may appriciate the Unfinishad Symphony without a profound knowledge of the physics of the vibratory disturbances which we call sound. Archaeology draws today upon physics, chemistry, geology, biology, economics, political science, sociology, climatology, botany and I know not what else. As a scicnce, archaeology is preeminently a synthetic process; and if we prefer it to regard it as an art or even as a philosophy, we must still affirm that it is an integration of sientifically observed and dissected phenomena relating to man; it is

still a synthesis.[২৩] 'ফোকলোর' এর তাত্ত্বিক আলোচনার সময় স্যার হুইলার প্রদত্ত পুরাতত্ত্ব বিষয়ক এ বিবৃতিটি প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়।

'ফোকলোর' বিজ্ঞান না সাহিত্য, অথবা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মিশ্রণফল, এ সম্পর্কিত বিরোধ-বিতর্কের প্রধান কারণ বোধ করি 'ফোকলোর' এবং 'ফোকলোরে'র উপাদান-উপকরণ সম্পর্কিত ধারণার অস্পষ্টতা। উপরন্তু কতিপয় পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ এহেন অস্পষ্টতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যালান ডাণ্ডেসের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লোকশ্রুতি, কিংবদন্তী, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা লোকচর্যা, লোকচিত্রকলা, ইন্দ্রজাল, লোকনাট্য ইত্যাদি উপকরণ-উপাদানকে 'ফোকলোর' নামে অভিহিত করেছেন, আর এই উপকরণ-উপাদান বিষয়ক তত্ত্বালোচনার নাম দিয়েছেন 'ফোকলোরিস্টিক্স্'।[২৪] 'ফোকলোরিস্টিক্স্' শব্দের বৃথা উদ্ভাবনের প্রভাবে শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত ও ডঃ শ্যামচাঁদ মুখার্জী প্রমুখ 'ফোকলোরোলজি'[২৫] শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'ফোকলোর'কে জ্ঞানতত্ত্বরূপে গ্রহণ করলে এই অনর্থবাচক শব্দ উদ্ভাবন স্বভাবতই অসার্থক। যাঁরা 'ফোকলোর'কে সাহিত্য কিংবা সাহিত্য ও বিজ্ঞানেব মিশ্রণফল বলে অভিহিত করেছেন তাঁরাও একই অস্পষ্ট ধারণার বশবর্তী। জন্মলগ্ন থেকেই 'ফোকলোর' শব্দটি এক বিশেষ জ্ঞানতত্ত্ব অর্থে প্রযুক্ত।[২৬] একটি দেশের ভূখণ্ডের সঙ্গে তার চারপাশের সীমান্তবর্তী দেশগুলির ভূখণ্ডের যেমন সংযোগ থাকে তেমনি 'ফোকলোরে'র সঙ্গেও নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, জাতিবিদ্যা ইত্যাদি তৎসন্নিহিত শাস্ত্রসমূহের অনিবার্য যোগাযোগ। তাই বলে 'ফোকলোর'কে নৃতত্ত্ব. সমাজবিজ্ঞান বা জাতিবিদ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা অসমীচীন। পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে মার্টিমার হুইলার ও ফোকলোর সম্পর্কে শ্রীসেনগুপ্তের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এ সিদ্ধান্তের সমর্থক।

অব্যাপ্ত হবে না, অতিব্যাপ্ত হবে না অথচ সংজ্ঞায়িতের সাধারণ ধর্ম ও বৈশেষিক লক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশ করবে, এহেন সার্থক সংজ্ঞা নির্ধারণ সহজ সাধ্য নয়। উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলির প্রায় সবই হয় অব্যাপ্ত, নয়, অতিব্যাপ্ত কিংবা সংজ্ঞায়িতের বৈশেষিক লক্ষণ সংজ্ঞায় অনুপস্থিত।

'ফোকলোর'-বিশেষজ্ঞগণ 'ফোকলোরে'র যে সমস্ত উপকরণ-উপাদানের কথা বলেছেন সেগুলি নিশ্চিতভাবে লোকসংস্কৃতিরই উপাদান-উপকরণ।

মানুষের জীবন-সংগ্রাম, প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তার-প্রয়াসের সামগ্রিক রূপের অন্যনাম সংস্কৃতি। উৎপাদন প্রক্রিয়াই সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার নিয়ামক। মানুষের সামাজিক স্থিতির স্বরূপই তার চেতনার নির্ধারক। কার্ল মার্কসের প্রসঙ্গিক বক্তব্য :

The mode of production in material life determines the general character of the social, political and spiritual processes of life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but, on the contrary, their social existence determines their conscionsness....With the change of the economic foundation the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed.[২৭]

অর্থনীতিই মূল সৌধ। সংস্কৃতি হল উপসৌধ। এবং সাংস্কৃতিক উপসৌধের ক্ষেত্রে পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং নিশ্চিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সাংস্কৃতিকত্বই 'ফোকলোরে'র বৈশেষিক লক্ষণ। এ উপসৌধের এহেন পরিবর্ধন, পরিবর্জন ও পরিবর্তনের কারণ, 'ফোকলোরে'র কেন্দ্রে যে মানবজীবনের স্থিতি সে মানবজীবনই পরিবর্তনশীল।[২৮] আদিম সাম্য-সমাজের মানুষের সঙ্গে অধুনাতন শ্রেণীবিভক্ত মানুষের অনেক পার্থক্য। মানুষের শ্রেণীহীন রূপ ও চেতনা আজ অভাবিত।[২৯] ফোকলোরের সংজ্ঞা নির্ধারণে এ সত্য অবশ্য স্মর্তব্য।

লোক জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে লোকসংস্কৃতির জন্ম। লোকসংস্কৃতি স্বরূপে ও স্বভাবে লোকজীবনের অনুগত। লোকসংস্কৃতি চলমান ও পরিবর্তনশীল. উত্থান-পতনবন্ধুর পথে তার যাত্রা।

লোকচর্যা, লোককথা, লোকচিত্রকলা, লোকশ্রুতি, লোকশিল্প, লোক-বিশ্বাস, লোকাচার, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি লোকজীবনের প্রয়োজনে লোকজীবনজাত বহুবিচিত্র উপাদান-উপকরণগুলি নয়, সে সব উপাদান উপকরণের সমবায়ে লোকসংস্কৃতি (folklore) শীর্ষক উপসৌধের বিকাশ ও বিবর্ধন। লোকসংস্কৃতি 'ভবিষ্যতের এক উচ্চতর সর্বজনগ্রাহ্য সাংস্কৃতিক উপসৌধ গড়ার চালিকা শক্তিরূপে আমাদের যুগের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারের সঞ্চয় নয়', সাংস্কৃতিক উপসৌধ। এজন্যেই লোকসংস্কৃতি (folklore) জ্ঞানতত্ত্বের তালিকাভুক্ত। এই উপসৌধের সাধারণ ধর্ম লোকজীবন বিষয়তা, সাংস্কৃতিকতা

তার বৈশেষিক লক্ষণ। অতএব লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা হল :

লোকজীবনের বাস্তব প্রয়োজনে লোকজীবনজাত, লোকজীবন সাপেক্ষ, লোকজীবনের অনুগত বহুবিচিত্র উপাদান-উপকরণের সমবায়ে গঠিত সাংস্কৃতিক উপসৌধের নামই লোকসংস্কৃতি (folklore)।

লোকসংস্কৃতি স্থাণু নয়, চলমান, কারণ লোকসাধারণের সামাজিক স্থিতিগত পরিবর্তন থাকলেও তার মৃত্যু নেই। লোকসংস্কৃতি শুধু আরণ্যক নয়, কেবল গ্রামীণ বা নাগরিক নয়, স্থানগতভাবে তা সর্বত্রচারী। লোকসংস্কৃতি বিশেষ কালের গণ্ডীতে বন্দী নয়, কাল থেকে কালান্তরে তার অনিবার্য অভিযান।

লোকজীবনের অগ্রগতি যেমন দ্বন্দ্বমূলক, লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লোকসংস্কৃতির নানা উপকরণ লোক-শ্রুতি, অতিকথা, কিংবদন্তী, রূপকথা, লোককথা ইত্যাদিতে বর্ণিত প্রাকৃতিক শক্তির রূপান্তরবিধান কাল্পনিক, অতএব মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র। মাও সে-তুঙের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য :

There are innumerable transformations in mythology,. ... But these legendary transformations of opposites are not concrete changes reflecting concrete contradictions. They are naive, imaginary, subjectively conceived transformations conjured up in men's minds by innumerable real and complex transformations of opposites into one another. Marx said, 'All mythology masters and dominates and shapes the forces of nature in and through the imagination ; hence it disappears as soon as man gains mastery over the forces of nature.' The myriads of changes in mythology (and also in nursery tales) delight people because these imaginatively picture man's conquest of the forces of nature, and the best myths possess 'eternal charm', as Marx put it ; but myths are not built out of the concrete contradictions existing in given conditions and therefore are not a scientific reflection of reality. That is to say, in myths or nursery tales the aspects constituting a contradiction have only an imaginary identity, not a concrete identity. The scientific reflection of the identity in real transformations is Marxist dialectics.[৩০]

পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মূলের স্বরূপ সংরক্ষণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়ের সাধারণ ধর্ম ও বৈশেষিক লক্ষণের ইঙ্গিতগর্ভ আত্মপ্রকাশ সার্থক নামরূপের অপরিহার্য সর্ত। পরিভাষা নির্মাণেও এই সর্তের প্রতি কোন উপেক্ষা অবাঞ্ছিত।

'জনপ্রিয় পুরাতত্ত্বকে অধিকতর নিপুণভাবে প্রকাশ করার জন্যেই ডব্‌লু. জে. টম্‌স্ কর্তৃক 'ফোকলোর' শব্দের উদ্ভাবন।[৩১] পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থপ্রসার হেতু বস্তুত 'ফোকলোর' অধুনা লোকসংস্কৃতির অন্যনাম।

'ফোকলোরে'র বাংলা প্রতিশব্দের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। তথাপি কোন পরিভাষাই অদ্যাবধি অবিসম্বাদিতভাবে গ্রাহ্য হল না। তার কারণ নিশ্চয়ই আছে, এবং তা একাধিক। 'ফোকলোরে'র পরিভাষাগত বিসম্বাদের অন্যতম কারণ বোধ করি পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর তুলনায় নামরূপের উপর পরিভাষাকারের অহেতুক ও অধিকতর গুরুত্ব আরোপ। স্যাক্সন ভাষার যৌগিক শব্দটিকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার ক্ষেত্রে কখনও শব্দের বাহ্যরূপের প্রতি আনুগত্য বজার রাখতে গিয়ে বিষয়ের প্রতি বিশ্বস্ততা বিসর্জিত হয়েছে, কখনও বিষয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে গিয়ে নামরূপের প্রতি প্রত্যাশিত অনুগত্যের অভাব ঘটেছে। 'ফোকলোরে'র বাংলা পরিভাষাসমূহ আলোচনা করলেই তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা স্পষ্ট হবে।

১. লোকযান : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায

'লোকযান' শব্দের ব্যুৎপত্তি : লোক+যান<[√যা+অন্ (ল্যুট)-ভা]। 'যান' শব্দের অর্থ হল : গমন, বাহন, অভিযান, শকট, মার্গ, পথ, মহাপরিনির্বাণোপায় (বৌদ্ধমতে)।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায এ পরিভাষার সমর্থনে যা বলেছেন তার সারমর্ম হল : মহাযান, হীনযান ইত্যাদির অনুসরণেই এ শব্দের পরিকল্পনা, কিন্তু ব্যুৎপত্তির দিক থেকে তার অর্থ—লোকসমাজের জীবনপদ্ধতি।[৩২]

এ পরিভাষার বিরুদ্ধাচরণ করে শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ বলেছেন : "...মহাযান, হীনযান, বজ্রযান ইত্যাদি ভাবানুষঙ্গে 'যান'-যুক্ত শব্দের একটা বিধি-নির্দিষ্ট জীবন-পদ্ধতি বোঝাতে পারে, কারণ পূর্বোক্ত 'যান'গুলি সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব ও অনুশাসনের ভিত্তিতে রচিত। রাজনীতিক্ষেত্রে 'ইজ্‌ম্' বা—'বাদ' পদাংশ

যেমন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'যান' অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা তেমনি। কিন্তু লোক-সমাজের জীবন-পদ্ধতি ঠিক কোন সুসংগঠিত 'ইজ্‌ম্'-ভিত্তিক নয়, বরং অনেক শিথিল। লোকসমাজের জীবনপদ্ধতি তাদের সমবেত জীবন-প্রয়াস থেকে স্বতঃ-উদ্ভূত। আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'যান' বা রাজনীতি ক্ষেত্রে 'ইজ্‌ম্' একজন বা একটা দলের থেকে প্রসূত। পরে সেটা জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োগ ও পরীক্ষার প্রয়াস চলে। সুতরাং 'যান'-এ এক বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মতামত বৃহত্তর জনমানসের অভিমুখী। আর ফোকলোর ঠিক তা নয়, বরং কিছুটা পরিমাণে তার বিপরীত, এখানে সমবায় ঐতিহ্যের বিষয় উত্তর-পুরুষে প্রবাহিত। ফোকলোর সমাজসৃষ্ট, আর যান মোটামুটিভাবে ব্যক্তিসৃষ্ট। সুতরাং 'যান' শব্দাংশ ব্যক্তিসৃষ্টির ভাবানুষঙ্গ জাগাতে পারে।'[৩৩]

উপরন্তু 'যান' শব্দের অর্থ 'জীবন মার্গ' বা 'জীবনপদ্ধতি' করতে হলে শব্দটির অর্থপ্রসারতাবিধান অনিবার্য। 'যান' শব্দের অর্থপ্রসার ঘটিয়ে 'জীবনপদ্ধতি' অর্থ গ্রহণ করলেও সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ, a way of life among the people অর্থে 'লোকযান' মানববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষারূপেও গৃহীত হতে পারে। 'ফোকলোর' অর্থে 'লোকযান' নিঃসন্দেহে অতিব্যাপ্ত। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ডঃ সুধীর করণের গবেষণা গ্রন্থের নাম 'সীমান্ত বাংলার লোকযান'।

২. লোকচর্যা : ডঃ সুকুমার সেন

লোকচর্যা শব্দের ব্যুৎপত্তি : লোক+চর্যা<[√চর্+য-ভা+স্ত্রী আ (টাপ্)]। 'চর্যা' শব্দের অর্থ : অনুষ্ঠান, আচরণ। ব্রত (মনু ১.১১১), বৈধকার্যানুষ্ঠান (মনু ৬.৩২)। অর্থের দিক থেকে লৌকিক ধর্মাচরণই লোকচর্যা। সুতরাং 'ফোকলোর' অর্থে 'লোকচর্যা' অব্যাপ্ত।

৩. লোকবৃত্ত : শঙ্কর সেনগুপ্ত

লোকবৃত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি : লোক+বৃত্ত<[√বৃৎ+ত (ক্ত)-ক]। 'বৃত্ত' শব্দের অর্থ হল : স্থিত, জাত (বৃত্ত : স সম্বন্ধঃ) (নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে, রঘু ২ ৫৮), সংঘটিত, অতীত (সীতাদেব্যাঃ কিং বৃত্তম্, উ. চ. ২.৬/৭) অপ্রতিহত (মনু ১.৬), আচার-আচরণ (রামা. ২.১০৯.৯, মনু ১০.১২৭), চক্রাকার, অসৎপ্রিয়াখ্যান (মনু ৪.১১), শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান (মনু ৪.২৬০), চরিত্র (মহা. ৩.৩১২.১০৮), জীবন (লোকবৃত্ত্যনুকরণম্ : নাট্যশাস্ত্র : আচার্য ভরত)।

লোকক্রে বৃত্ত করে যে জ্ঞান তাকেই শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত 'লোকবৃত্ত' বলেছেন।

ব্যাসবাক্যের অন্যতম মুখ্য শব্দ 'জ্ঞান' সমাস-নিষ্পন্ন সমস্তপদ 'লোকবৃত্ত' থেকে তিরস্কৃত। অন্যতম প্রধান বস্তু বর্জনের ফলে বহুল প্রচলিত 'লোকবৃত্ত' শব্দটি প্রত্যাশিত অর্থবহনে অক্ষম ও অনর্থবাচক হয়ে পড়েছে।

অধিকন্তু শ্রীসেনগুপ্তের অভিপ্রেত অর্থ মেনে নিলেও লোকবৃত্তকে নৃতত্ত্ব কিংবা মানববিদ্যার পরিভাষারূপেও প্রয়োগ করা যায়। কারণ 'ফোকলোরে'র বৈশেষিক লক্ষণ 'লোকবৃত্তে' কোন ব্যঞ্জনার ছায়া ফেলে নি। অতএব তাঁর এ পরিভাষা অতিব্যাপ্ত। লোক ব্যবহার কিংবা লৌকিক আখ্যান অর্থে 'লোকবৃত্ত' (মনু ৪.১১) শব্দ গ্রহণ করলেও পরিভাষাটি অব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

৪. লোকশ্রুতি : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

লোকশ্রুতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি : লোক+শ্রুতি<[√শ্রু+তি (ক্তিন্)-ভা] 'লোকশ্রুতি'র অভিধার্থ : জনশ্রুতি, কিংবদন্তী (রামা. ১.২.৪৫, রামা. ২.১১০.২৮ ভাগ, ৪.২১.৪৬, পঞ্চতন্ত্র ২.৭৪)। অর্থের দিক থেকে লোকশ্রুতি ফোকলোরের পরিভাষা হিসাবে অব্যাপ্ত। এ অব্যাপ্তি সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্যও সচেতন। তাঁর বক্তব্য : 'লোকশ্রুতি বলিতে আমি ইংরাজি Folklore কথাটিই বুঝিয়াছি। তবে Folkore কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, এখানে আমি তাহা সীমায়িত করিয়া বাংলার লৌকিক ধর্ম ও লোকাচারকেই বুঝাইতে চাহিয়াছি'। 'লোকশ্রুতি' পরিভাষা সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : 'Loka Sruti' which does not seem suitable, for it comes down to the category of 'Jana Sruti' and 'Kimvadanti' already in existence...'[৩৫] এদিক থেকে 'ফোকলোরে'র পরিভাষা হিসাবে 'লোকশ্রুতি' অনর্থবাচক।

৫. লোকবিজ্ঞান : ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডঃ সত্যেন্দ্র, ডঃ ইন্দুপ্রকাশ পাণ্ডে

'লোকবিজ্ঞান' শব্দের ব্যুৎপত্তি : লোক+বিজ্ঞান>[বি—√জ্ঞা+অন (ল্যুট)-ভা]। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ : বিশেষ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শাস্ত্র (হিতোপদেশ ৩.৩৮)। সুতরাং লোকবিজ্ঞানের পরিধি নৃতত্ত্ব, মানববিদ্যা এমন কি সমাজ-বিজ্ঞানের অনেকাংশকেও আত্মসাৎ করে। অতএব 'ফোকলোরে'র পরিভাষা হিসাবে 'লোকবিজ্ঞান' অতিব্যাপ্ত। অধিকন্তু 'ফোকলোরে'র বৈশেষিক লক্ষণের ব্যঞ্জনা 'লোকবিজ্ঞান' শব্দে অনুপস্থিত। 'লোকবিজ্ঞান' পরিভাষার বিরোধিতা প্রসঙ্গে ডঃ দুলাল চৌধুরীর মন্তব্য কিন্তু 'ফোকলোরে'র স্বরূপকে অধিকতর অস্পষ্ট করে ফেলেছে। ফোকলোরের উপাদান-উপকরণকে

'ফোকলোর' হিসাবে গ্রহণ করে তিনি 'লোকবিজ্ঞানকে অব্যাপ্ত ও অযথার্থ বলেছেন।[৩৫]

৬. লোকায়ন : অরুণকুমার রায়

'লোকায়ন' শব্দের ব্যুৎপত্তি : লোক+অয়ন<[√অয়+অন্ (ল্যুট)-ভা]। 'অয়ন' শব্দের অর্থ : গমন, গতি (বাজসনেয়ি-সংহিতা ৩১.১৮, প্রশ্নোপনিষৎ ৬.৫, পরাশর ১২.৭১)। আবার [√অয়+অন-ণ] 'অয়ন' শব্দের অর্থ মার্গ, পথ [রঘু ১৬.৪৪, ধর্মমঙ্গল (মানিক গাঙ্গুলি) ৩৯,৮৭] [√অয়+অন-র্ম]< 'অয়ন' অর্থ আশ্রয় (মনু. ১.১০)। অয়ন শব্দের অন্য অর্থ 'শাস্ত্র' (তারানাথ তর্কবাচস্পতি-সংকলিত 'বাচস্পত্য' অভিধান)। সে সব কারণে 'লোকযান', 'লোকবিজ্ঞান' 'ফোকলোরে'র সর্বার্থসার্থক পরিভাষা নয়, সে সব কারণেই 'লোকায়ন'ও 'ফোকলোরে'র পরিভাষারূপে সর্বার্থসিদ্ধি অর্জনে অক্ষম। 'লোকশাস্ত্র' অর্থে 'লোকায়ন' 'ফোকলোরে'র পরিভাষারূপে অতিব্যাপ্ত। 'লোকের আশ্রয়' অর্থে 'লোকায়ন' (নারায়ণায়…লোকায়নায়…, হরিবংশ ১৫৪.৩৯) এক্ষেত্রে অনর্থবাচক।

৭. লোকবিদ্যা : রমাপ্রসাদ চন্দ

Lore (Learning) of the folk-এর বাংলা হিসাবে লোকবিদ্যা নির্ভুল। কিন্তু প্রতিটি ভাষার শব্দের সঙ্গে ভাষাভাষীদের সংস্কার জড়িত। সেদিক থেকে 'লোকবিদ্যা' মানববিদ্যাকে আত্মসাৎ করে। যে অর্থে 'লোক বিজ্ঞান' অতিব্যাপ্ত, সেই কারণে 'লোকবিদ্যা'ও ফোকলোরের বৈশেষিক লক্ষণকে আত্মস্থ না করে অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। [√বিদ্+য (ক্যপ্)-ণ+স্ত্রী. আ (টাপ্), পাণিনি ৩.৩.৯৯]>'বিদ্যা' শব্দের অর্থ : জ্ঞানসাধন, শাস্ত্রাভ্যাস বা অধ্যয়নহেতুক জ্ঞান। এই অর্থে লোকবিদ্যা 'লোকশাস্ত্রাভ্যাসহেতুক জ্ঞান' রূপে গৃহীত হতে পারে। লোকতত্ত্বজ্ঞান (উত্তরচরিত ৭.৬) অর্থেও 'লোকবিদ্যা' গ্রহণ করা যায়। এদিক থেকে 'ফোকলোরে'র পরিভাষা হিসাবে 'লোকবিদ্যা' সর্বার্থসিদ্ধ নয়।

৮. লোকসাহিত্য : মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম
জনসাহিত্য : ডঃ প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী
গ্রামসাহিত্য : রামনরেশ ত্রিপাঠী
লোক-বাঙ্ময় : কেশরীনারায়ণ শুক্ল
লোকবার্তা : ডঃ বাসুদেবশরণ আগরওয়ালা

'ফোকলোরের পরিভাষা হিসাবে 'জনসাহিত্য', 'গ্রামসাহিত্য', 'লোকবাঙ্ময়' ও 'লোকবার্তা' প্রভৃতি যে অব্যাপ্ত তা বিশদ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। এ পরিভাষাগুলি 'ফোকলোর' নয়, 'ফোকলোরে'র অংশবিশেষরই নামরূপ।

৯. লোকলোর : ডঃ মযহারুল ইসলাম

'লোকলোর' শব্দটি দুটি বিভিন্ন ভাষার শব্দসমবায়ে গঠিত [বাংলা. 'লোক' +ইংরাজি. 'লোর' (Lore)]। আধা ইংরাজি আধা বাংলা শব্দকে যদি বাংলা পরিভাষারূপে প্রয়োগ করতে হয় তাহলে 'ফোকলোর' শব্দটাই বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা সমীচীন। কত বিদেশী শব্দই তো, বাংলায় গৃহীত হয়েছে।

১০. ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক 'ফোকলোর' অর্থে সাহিত্যকে সংস্কৃতি-বহির্ভূত করে 'লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৩৬]

ডঃ বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া 'ফোকলোর' অর্থে 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'লোকসংস্কৃতি'ই বোধ করি 'ফোকলোরে'র সার্থক পরিভাষা। 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি : লোক+সংস্কৃতি<[সম্— √কৃ+তি (ক্তিন্)-ভা]। 'সম্' উপসর্গ, অর্থ 'সম্যক'। 'কৃতি' শব্দের অর্থ : ক্রিয়া, কারণ, সাধন (বাসবদত্তা ২), সৃষ্টি (পাণিনি ২.৩.৬৬ সিদ্ধান্ত কৌমুদী), কর্তব্যব্যাপার, [+তি-র্ম] করণীয় বিষয় (মহা. ৩ ১৮০.৩০.), কবিকৃতি (রঘু ১৬ ৩৩), [+তি-ণ] কুহক (মহা ১৩.৪০.৮)। ভাব, অর্থ ও ব্যুৎপত্তির দিক থেকেও 'লোকসংস্কৃতি' 'ফোকলোরে'র যথার্থ পরিভাষা। 'ফোকলোরে'র সাধারণ ধর্ম ও বৈশেষিক লক্ষণের ব্যঞ্জনাকে আত্মসাৎ করে শব্দটির পারিভাষিকতা সর্বার্থসিদ্ধ।

ডবলু. জে. টম্‌স্ বিদ্যা (learning) অর্থে 'লোর' কথাটি গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা বলেছি। কিন্তু জার্মান ভাষায় 'Lore'-এর অভাব নেই। প্রাচীন ইংরাজিতে শব্দটি হল 'lâr', ডাচ ভাষায় leer এবং জার্মান ভাষায় 'lehre'। এ শব্দগুলির অর্থ বিদ্যা (lerning)। অথচ জার্মান শব্দটি 'Volks-lehre' নয়, 'Volks-kunde'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জার্মাণরা সভ্যতা (civili sation) অর্থে Kultur (>Culture) শব্দ প্রয়োগ করেন। বাংলা ভাষাতে 'Culture' অর্থে 'কৃষ্টি'র প্রচলন একদা ব্যাপক ছিল, বর্তমানেও আছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কোনদিনই culture-কে সংস্কৃতি বলিতে রাজী হন নি। তিনি বলতেন 'কৃষ্টি'। 'কালচার' শব্দের অভিধার্থ ও গঠন

অনুসারে কর্ষণাত্মক '‘কৃষ্টি’ শব্দের উৎপত্তি। অতএব মূলানুগত্যের দিক থেকেও ‘ফোকলোরে’ পরিভাষারূপ ‘লোকসংস্কৃতি’ সার্থক।

‘ফোকলোর’-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রসঙ্গত প্রস্তাব করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হিন্দী পরিভাষা কমিশন (Commission for Scientific & Technical Terminology) এ সম্পর্কে অনেক দূর এগিয়েছেন এবং সর্ব-ভারতের গ্রহণযোগ্য পরিভাষা নাকি প্রায় সমাপ্ত করে এনেছেন।

Folklore	লোকসংস্কৃতি
Folklore study	লোকসংস্কৃতিচর্চা
Folklorist	লোকসংস্কৃতিবিদ
Folktales	লোককথা
Folk-Ballads	লোকগাথা
Folksong	লোকগীতি
Folk-Music	লোকসঙ্গীত
Folk-Drama	লোকনাট্য
Folk rites and rituals	লোকচর্যা
Folk feast and festivals	লোক-উৎসব-অনুষ্ঠান
Folk-custom	লোকাচার
Folk-art	লোকচিত্রকলা
Folk-craft	লোকশিল্প
Folk-believe	লোকবিশ্বাস
Folk-speech	লোকভাষা
Folk-anecdotes	লোকবৃত্ত
Folk-education	লোকবিদ্যা
Folk-life	লোকজীবন
Fables	উপকথা
Charms	জাদু
Legend	লোকশ্রুতি
Saying	কিংবদন্তী

Proverb	প্রবাদ
Idioms	প্রবচন
Riddle	ধাঁধা
Magic	ইন্দ্রজাল
Rhyms (Verse)	ছড়া
Fairy-tales (Merchens)	রূপকথা
Tradition	ঐতিহ্য
Superstitions	ভ্রান্ত সংস্কার
Folk-news	লোকবার্তা
Folk-communication	লোকযান
Folk-way	লোকায়ন
Folk-religion	লোকধর্ম

বাংলার লোকসংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে যে মত প্রধান ও সর্বাধিক মুখর সে মত অনুসারে নির্ধারিত লোকসংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে যে সব সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হতে হয় তা হল :

ক. কৃষিভিত্তিক জীবনের সীমায় লোকসংস্কৃতি সীমায়িত। তার বাইরে লোকসংস্কৃতির অস্তিত্ব অভাবিত।

খ. গ্রামাঞ্চলেই লোকসংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্ধন সীমায়িত।

গ. সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিই লোকসংস্কৃতির ভিত্তি। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবসানে লোকসংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়।

ঘ. লোকসংস্কৃতি আদিম লোকসমাজের সাংস্কৃতিক জীবাশ্ম। 'অধুনাতন অর্থ নৈতিক-সামাজিক পরিবেশে তার প্রাণবন্ত অস্তিত্ব অসম্ভব।

ঙ. ' লোকসংস্কৃতি আদিম, অসাক্ষর, অশিক্ষিত, অসভ্য মানুষের সৃষ্টি। শিক্ষা, সভ্যতা লোকসংস্কৃতির অন্তরায়।

চ. অকারণ আনন্দ থেকেই লোকসংস্কৃতির জন্ম।

ছ. লোকসংস্কৃতি মৌখিক শিল্প।

জ. লোকসংস্কৃতি শুধু লৌকিক ধর্ম ও লোকাচারের সমবায়ে গঠিত।

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে এ সব সিদ্ধান্তের প্রতি আমার অনাস্থা ঘোষিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত :

ক. কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনের সীমায় লোকসংস্কৃতি সীমাবদ্ধ নয়। মানবসভ্যতার তথা ইতিহাসের আদিম স্তর থেকে সুরু করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উত্থান-পতনবন্ধুর পথ অতিক্রম করে ভাবীকালের শ্রেণীহীন সমাজে তার অপরাজেয় অভিযান।

খ. গ্রামাঞ্চলে লোকসংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্ধন সীমায়িত নয। আরণ্যক, গ্রামীণ, নাগরিক সংস্থান নির্বিশেষে সভ্যতার সর্বস্তরে লোকসংস্কৃতির দৃঢ় দৃপ্ত পদসঞ্চার।

গ. কেবল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উপরই লোকসংস্কৃতির ভিত্তি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী, সর্বপ্রকার

অর্থনীতি, সামাজিক বিবর্তন-পরিবর্তনের ধারায় বিবর্তনশীল লোকসংস্কৃতির ভিত্তি। অর্থনীতি নিশ্চয়ই মূল কথা, অর্থনীতিই বনিয়াদ।

ঘ. লোকসংস্কৃতি কোন বিশেষ সমাজের সাংস্কৃতিক জীবাশ্ম বা ফসিল নয়। লোকসংস্কৃতি চিরবহমান, অমর।

ঙ. লোকসংস্কৃতি লোকসাধারণের সামগ্রিক জীবন প্রযাসের অন্যনাম। আদিম-আধুনিক, সাক্ষর-অসাক্ষর, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি বিচারের মানদণ্ড নয়।

চ. অকারণ আনন্দ থেকে নয়, শ্রম-প্রক্রিয়া তথা মেহনতের উৎস থেকেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব।

ছ. লিখিত না মৌখিক, এ প্রশ্ন লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক স্বরূপবিচারে অবান্তর।

জ. লোকসংস্কৃতি শুধু লৌকিক ধর্ম বা লোকাচারের সমবায়ে গঠিত নয়, লোকসংস্কৃতি সম্যক লোকসংস্কৃতির সম্মিলন-ফল।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই বাংলার লোকসঙ্গীত, লোকচর্যা ও লোক-চিত্রকলার পরবর্তী আলোচনা। এ যাবৎ লোকসংস্কৃতি (folklore) সম্পর্কে যে মতাদর্শ ও বক্তব্য প্রচলিত 'লোকায়ত বাংলা'য় তার বিশদ আলোচনা অনুপস্থাপিত। কারণ তা লোকসংস্কৃতি-সন্ধিৎসু পাঠক-গবেষক মহলে ব্যাপক প্রচলিত বলেই অনুমিত। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থের পরিসর এবং সর্বোপরি আলোচনার নির্ধারিত ধারাও অন্য মতবাদ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনার পরিপন্থী। 'লোকায়ত বাংলা' বললে পাঠকের মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয় এ গ্রন্থ তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়। লোকজীবনজাত এবং লোকজীবনে প্রসারিত লোক-সংস্কৃতির কতিপয় শাখা এ গ্রন্থের আলোচ্য। লোকসমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠতা ও কর্তব্যের প্রতিই আলোচনার দৃষ্টি সর্বাধিক নিবদ্ধ।

ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিরিখে বাংলা ভাষায় লোকসংস্কৃতি বিষয়ক এই প্রথম আলোচনা-গ্রন্থের উদ্দেশ্য বাংলা দেশের লোকায়ত সাংস্কৃতিক উপসৌধ সম্পর্কে প্রচলিত ভাববাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে এ যাবৎ অনুপস্থিত অন্যমতের উপস্থাপনা।

পাদটীকা

১ The word folklore was introduced into English usage by W. J. Thoms in a letter written under the pseudonym of Amborse Merton which appeared in the Athenaeum in Aug. 1846. In this he suggested that "a good Saxon compound Folk-Lore" could be more aptly used to describe "what we in England designate as Popular Antiquities, or Popular Literature."

—Encyclopaedia Britanica, Vol. IX. p 511

২. Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends, Vols. 2 (1949) : Ed. Maria Leach.

৩. Folklore, the generic name used to denote those traditional beliefs, superstitions, manners, customs and observances of ordinary people which have persisted from earlier into later periods and wh ch, in fragmentary, modified or comparatively unchanged form, have continued to exisit outside the accepted pattern of contemporary knowledge and religion, in some cases down to modern times. Folk tales, traditional ballads, folk songs and proverbs also come under this heading, by a recent extension of meaning, certain aspects of material culture originally excluded by definition.

—Encyclopaedia Britanica, Vol. IX, p. 518.

৪. The Dictionary of World Literature : Ed. Joseph T. Shipley, pp. 161-62.

৫. ibid.

৬. A Survey of Folklore Study in Bengal : West Bengal and East Pakistan : Sankar Sengupta, p. 37.

৭. বাংলার লোকশ্রুতি : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৮. Folklore Museum : Dr. S. C. Mukherjee, p, 14.

৯. ibid, p. 15.

১০ ibid.

১১. ibid,

১২. ibid, p 16

১৩. ibid.

১৪. ibid.

১৫. ibid. p. 1.

১৬. Encyclopaedia Britanica, Vol IX. p. 518

১৭. ibid.

১৮. ibid. p. 520

১৯. 'ফোকলোর' ও ভারতীয় প্রতিশব্দ : দুলাল চৌধুরী, চতুষ্কোণ (অগ্রহায়ন, ১৩৭৫), পৃ. ৬২১

২০. লোকায়নচর্চার ভূমিকা : অরুণকুমার রায়, লেখা ও রেখা (শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৫) পৃ. ৩১

২১. বিবিধ প্রবন্ধ। শঙ্কর সেনগুপ্ত ও অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, কল্যাণী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৭২

২২. Studis in Indian Folk Culture—Folksongs: Folkarts: Folk-literature, Ed. Sankar Sengupta and K. D. Upadhyaya, Calcutta, 1964.

২৩. Archaology from the Earth: Sir Mortimer Wheeler: A Pelican Book, 1956.

২৪. Study of Folklore (1965): Ed. Alan Dundes, Calif. U. S. A.

২৫. A Survey of Folklore Study in Bengal: Sankar Sengupta. p. 38. and Folklore Museum . Dr. Shyamchand Mukherjee, p, 4.

২৬. লণ্ডন ফোকলোর সোসাইটির সভাপতি A. R. Wright 'ফোকলোরে'র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন: It (folklore) might be defined as the science which studies the expression, in popular beliefs, institutions, practices, oral literature and arts and past times of the mental spiritual life of the folk, the people in every stage of culture." ("বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থে শঙ্কর সেনগুপ্ত বিরচিত "লোকবৃত্ত" রচনা থেকে)।

২৭. Author's Preface: Critic of Political Economy: Karl Marx, pp. 11-12.

২৮ He (man) opposes himself to nature as one of her own forces, setting in motion the arms and legs, head and hands, the natural forces of his body, in order to appropriate nature's productions in a form adapted to his own wants. By thus acting on the external world and changing it, he at the same time changes his nature.

—Capital: Karl Marx, Vol. I, pt. III Ch. vii, Sec. I

২৯. In class society everyone lives as a member of a particular class, and every kind of thinking, without exception, is stamped with the brand of a class.

—Four Essays on Philosophy: Mao Tse-Tung, pp. 2-3.

৩০. Four Essays on Philosophy : Mao Tse-Tung, p. 65.

৩১. 'Folklore' শব্দটি সম্ভবত জার্মান 'Volkskunde' শব্দের ডবলু. জে. টমসকৃত অনুবাদ। এহেন ধারণার কারণ, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'Volkskunde' শব্দটি প্রচলিত আর 'Folklore' শব্দের উদ্ভাবন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে।

৩২. I think "Loka-yana" would be a good Indian equivalent in imitation of "Maha-yana", "Hina-yana", "Vajra-yana", "Deva-yana" etc., in as much as, it means "A way of life (Yana) among the people (Loka)" which is carried down by tradition without any book learning or sophistication.

—Indian Folklore, Vol. I, No. I, p. 4.

৩৩. বাংলা দেশের লোকচর্যার এক অধ্যায় : চিত্তরঞ্জন ঘোষ, প্রবন্ধ পত্রিকা, পৃ. ১-২

৩৪. বাংলার লোকশ্রুতি : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩৫. চতুষ্কোণ, পূর্বোল্লিখিত সংখ্যা।

৩৬. বিবিধ প্রবন্ধ : সাম্প্রতিক বাংলার লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতি-চর্চা : নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ. ৫২-৮০।

* প্রসঙ্গত : স্মর্তব্য যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হিন্দী পরিভাষা কমিশনের Expert Advisory Committee of the Literary Criticism বা 'সাহিত্য সমালোচনা বিশেষ উপদেষ্টা কমিটি'র সদস্য শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রস্তাবিত পরিভাষাগুলো পারিভাষিক কমিটির কাছে উপস্থাপিত করতে পারেন।

লোকসঙ্গীত

মানুষ, মেহনত ও গান

যৌথ প্রবণতা লোকসঙ্গীতের অনশ্বর স্বভাব। জন্মসূত্রেই লোকসঙ্গীত সে মৌল স্বভাবের সত্বাধিকারী। মেহনতী মানুষকে উদ্দীপিত, অনুপ্রেরিত করাই প্রথমাবধি তার অনন্য কৃত্য।

চতুষ্পদী দীনতাকে অতিক্রম করে মেহনতের এক বিশেষ স্তরে প্রাক-ইতিহাস ও ইতিহাসের সন্ধিলগ্নে মানুষ দুপায়ে দাড়াল। তার দুই হাত মুক্তি পেল। অবারিত হল ব্যাপক দক্ষতা আর অনন্ত নৈপুণ্য অর্জনের অধিকার। কেবলমাত্র শ্রমের দৌলতে, শ্রম প্রক্রিয়ার ক্রমোন্নত প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের শরীরে সমুন্নত পেশী আর অস্থি-সংযোজক ঝিল্লী এবং কালক্রমে বিবিধ অস্থি উপার্জিত হল। শ্রম প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হাতের দৌলতে সর্বৈব মানবিক বৈভব ও ক্রমোন্নতি সাধিত হল সর্ব শরীরে।[১] মানুষের এই হাত কেবলমাত্র মেহনতের মাধ্যম নয়, মেহনতের ফসলও। মেহনতই সমস্ত মানবিক বিষয়বস্তুর উৎস। মেহনতের দৌলতেই মানুষের যাবতীয় অস্তি প্রাপ্তির বাস্তবতা।[২] বাস্তব জীবনে উৎপাদন প্রক্রিয়াই বস্তুত মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।[৩]

শ্রম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সাধিত হল সমুন্নত মস্তিষ্কের যাবতীয় বিকাশ ও বিবর্তনের সমূহ সম্ভাবনা। প্রথমত মেহনত, তারপর মেহনত-অনুসারী সহচর ভাষার প্রভাবযুক্তেই মস্তিষ্কের ব্যাপক বিকাশ। যৌথ জীবন প্রয়াসের অনিবার্য তাগিদেই শ্রমানুষঙ্গিক ভাষার উদ্ভব।[৪] মুক্তিমার্জিত হাতের হাতিয়ার আর নৈকষ্য নিপুণ মুখের ভাষা, প্রাক-মনুষ্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের দুটি প্রধান পার্থক্যচিহ্ন।

মনুষ্যেতর প্রাণী বহিঃপ্রকৃতিকে নিছক ব্যবহার করে আর কেবলমাত্র স্বীয় স্থিতির মাধ্যমেই সূচিত করে বহিঃপ্রাকৃতিক তারতম্য। কিন্তু মানুষ আপন

পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃতিকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন করে নেয়, প্রকৃতিকে জয় করে।[৫]

শ্রম প্রক্রিয়ার বিকাশ ও মানুষের হাতের কার্যকারিতার বিবর্ধন অবিচ্ছেদ্য ভাবে ঘনিষ্ট। আর সে বিকাশ ও বিবর্ধনের উৎস থেকেই বাক উৎসারিত। বাক আর বাকযন্ত্রের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি মেহনতেরই প্রতিক্রিয়াজাত।[৬]

প্রকৃতিকে জয় করার সংগ্রামে শ্রম প্রক্রিয়ার বিশেষ স্তরেই লোকসঙ্গীতের জন্মলাভ। লোকসঙ্গীত তথা তদানীন্তন যাবতীয় সাঙ্গীতিক প্রয়াস সংগ্রামী মানুষের জীবন বিকাশের যুদ্ধে অব্যর্থ ও অপরিহার্য হাতিয়ার বলে গ্রহণ করলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে না।

সঙ্গীত সুর-ছন্দনির্ভর শিল্প। গান শ্রুতিসাপেক্ষ। মেহনত থেকেই শ্রুতির উদ্ভব।[৭] সমাজবদ্ধ মানুষের গানে শ্রমজাত ছন্দ সামাজিক ক্রিয়া হিসাবেই বিকশিত। মানুষের ইচ্ছা ও ক্রিয়াকে সংহত সার্থক করার জন্যে, মানুষের অনুভব-সাযুজ্যের দ্বারা পারস্পরিক ঐক্য বিধানের জন্যে সুর ও ছন্দ জন্মাবধি সক্রিয়।

মেহনতের উৎস থেকেই মস্তিষ্ক ও বাকশক্তির সবাত্মক উৎসার। প্রাগৈতিহাসিক শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছন্দের বীজ নিহিত। মেহনতে নিযুক্ত মানুষের কায়িক প্রতিক্রিয়ার ফলে শ্রমধ্বনির সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। এ শ্রমধ্বনিই কালক্রমে বিস্তৃতবাক সঙ্গীতে প্রসারিত। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের মেহনতী মানুষের গানে শ্রমধ্বনির অস্তিত্ব অবিরল। উদাহরণস্বরূপ :

রাস্তার পাশে ইয়োরোপীয় মনিবের পাথর ভাঙছে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি উপজাতীয় বালক। পাথর ভাঙার তালে তালে চলছিল তার স্বতঃস্ফূর্ত গান :

They treat us badly, ehé !
They are hard on us, ehé !
They drink their coffee, ehé !
And give us none, ehé ![৮]

ehé-শ্রমধ্বনির পুনরাবৃত্তি ও হাতুড়ির ধারাবাহিক আঘাত এখানে ঐকতান রচনা করেছে। এই *ehé*-শ্রমধ্বনি থেকেই গানটি বিকশিত আর এ শ্রমধ্বনির নিশ্চিত উৎস ঐ পাথর ভাঙার কাজ। শ্রমিকটির সমসাময়িক বাস্তব অনুভূতির অনিবার্য প্রকাশ এখানে কিয়ৎ পরিমাণ কথার অবয়বে। সে অবয়বে শ্রমধ্বনি সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত।

মধ্য আফ্রিকার মুটেদের একটি গান :

The wicked white man goes from the shore—puti puti !
We will follow the wicked white man—puti puti !
As long as he gives us food—puti puti !
We will cross the hills and streams—puti puti !
With the great merchant's caravan—puti puti ![৯]

puti puti ধুয়ার মধ্যে শ্রমধ্বনির স্পষ্ট অস্তিত্ব বিদ্যমান। রুশের নৌ-সঙ্গীতেও এহেন শ্রমধ্বনির অস্তিত্ব ব্যাপক। যেমন :

E-úch-nyem ! e-úch-nyem ; Yeshchó rázik ! Yeshchó
Razovyóm my beryózu, razovyóm my kudryávu !
Aida da, áida ! razovyóm ! Aida, da, áida ! kudryávu !
E-úch-nyem ! e-úch-nyem ! Yeshchó rázik ! yeshchó
daráz ![১০]

ঢাকা-বরিশালের নৌকা বাইচের গান, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জুমিয়াদের জুমের গানে **হৈ হৈ হৈয়া** বা **হৈ হৈয়া** ইত্যাদি শ্রমধ্বনির অস্তিত্ব অদ্যাবধি ব্যাপক। মেহনতী মানুষের গানে শ্রমধ্বনির যে অস্তিত্ব ছিল সর্বাত্মক তা পরবর্তী কালের অভিজাত সঙ্গীত আঙ্গিকেও স্বাধিকারে সঞ্চারিত। বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের দুই প্রত্যন্ত থেকে এবংবিধ শ্রমধ্বনির উদাহরণ প্রসঙ্গত সন্নিবিষ্ট করা যেতে পারে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। প্রাচীন ঝুমুর গানের প্রভাবচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সঙ্গীতাংশে সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকার নিম্নোধৃত নিবেদনে শ্রমধ্বনির অস্তিত্ব দ্রষ্টব্য :

অতি দুঃখিনী বালী ল।

আল

নবনীদল কোঅলা ল।

আল

মদনবাণে পরাণে আকুলী ল॥
বিরহে না মার মোরে ল।

আল

চরণে ধরোঁ তোরে ল।

আল

তিরিবধ পাপ নাহিক ডর তোহ্মারে ল

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের নৌকাখণ্ডের **একটি** বর্ণনামূলক সঙ্গীতে শ্রমধ্বনির নিদর্শন স্পষ্টতর .

যবে রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ
হেহে লহে লহে।
তবে **হিঅ হিঅ** বুলি কাহ্নু বাহে নাএ
হেহে লহে লহে॥

এহেন শ্রমধ্বনি সন্নিবেশের ফলে সঙ্গীতগুলির জীবনঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'পাল্কীর গানে' স্বরারোপ করতে গিয়ে সুরকার যথোচিত শ্রমধ্বনি সংযোগ করে গানটিকে মৃত্তিকাঘনিষ্ট স্বাভাবিকতায় মণ্ডিত করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'পাল্কীর গান' কবিতায় শ্রমধ্বনি সন্নিবিষ্ট ছিল না। কিন্তু সুরকার এ কবিতায় স্বরারোপ করতে গিয়ে শ্রমধ্বনি প্রয়োগের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। শ্রমধ্বনি প্রযুক্ত না হলে 'পাল্কীর গান' কবিতার সাঙ্গীতিক রূপায়ণে প্রত্যাশিত গতি, মৃত্তিকাঘনিষ্ট স্বাভাবিকতা ও জীবনরসসিক্ত বাস্তবতার অভিব্যক্তি এতটা পরিপুষ্ট হত না। বক্তব্যের স্পষ্টতা বিধানের জন্য 'পাল্কীর গানে' শ্রমধ্বনি প্রযোগ ব্যাপারের আংশিক নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হল। পাল্কীর গান কবিতার প্রথম স্তবকের কয়েকটি চরণ :

পাল্কী চলে।
পাল্কী চলে।
গগন-তলে
আগুন জ্বলে।
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!
ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'
পাটায় বসে
ঢুলছে ক'সে![১১]

সুরকার কৃত শ্রমধ্বনি প্রয়োগের ফলে এ কবিতাংশের সঙ্গীত রূপায়ণে যে ভাব ও অবয়বগত পার্থক্য ঘটেছে তা নিম্নরূপ :

হুম্ না হুম্ না।
হুম্ না হুম্ না!
পাল্কী চলে। হুম্ না—
পাল্কী চলে। হুম্ না—
গগন-তলে
আগুণ জলে। হুম্ না, হুম্ না—
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল্ গায়ে—হুম্ না, হুম্ না —
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা। হুম্ না, হুম্ না—
ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি'—হুম্ না, হুম্ না—
পাটায় বসে
ঢুলছে ক'সে। হুম্ না, হুম্ না— [১২]

শ্রমধ্বনি প্রয়োগজাত এহেন সার্থকতার হেতু সুর ও ছন্দের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট শ্রম-প্রক্রিয়ার প্রতি যথোচিত আনুগত্য। মেহনত ও মেহনতের বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মেহনতী মানুষের গতিভঙ্গ এবং ধ্বনিবৈশিষ্ট্য 'পাল্কীর গান' কবিতার সুরারোপে সম্পৃক্ত। এই শুদ্ধ সম্পর্কই গানটির সুর-সংযোজনাগত স্বাভাবিকতার বাস্তব ভিত্তি।

মেহনতী মানুষের ছন্দোবদ্ধ অঙ্গসঞ্চালনই কথা, সুর ও ছন্দের সম্মিলিত সৃষ্টি সঙ্গীতকে সম্ভব করেছে। শ্রম প্রক্রিয়াই কায়া সঞ্চালনজাত নৃত্য ও শাব্দিক আন্দোলনজাত গানের নিশ্চিত নিয়ামক। সঙ্গীতের আদি অকৃত্রিম উদ্দেশ্য বোধ হয় উৎপাদনশীল শ্রমকে সার্থক করে তোলা এবং শ্রমসাধ্য উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করা। কালক্রমে তাই সঙ্গীত স্বভাবত সম্মোহন-সংযুক্ত। ছন্দ সে সম্মোহনের অন্যতম সার্থক সহযোগী। অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে নাচে গানে বাস্তবতার উপর মায়া আরোপের প্রয়াস স্পষ্ট। সমাজ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব থেকেই ইন্দ্রজাল চেতনার উদ্ভব। পৃথিবী

যাবতীয় শ্রমসঙ্গীতে ইন্দ্রজালচেতনার সার্বিক প্রসার তাই দুর্লক্ষ্য নয়। কালক্রমে এই সম্মোহনচিন্তা লোকায়ত অনুষ্ঠান-সঙ্গীতে সংক্রমিত। মেহনতজাত গানের মধ্যে বাস্তবতার উপর অভিপ্রায়ের মায়া আরোপ করার যে প্রযাস দৃষ্ট হয় এই সম্মোহন বা ইন্দ্রজালচেতনা তারই স্বাভাবিক সহযোগী।

শ্রেণীহীন আদিম সমাজে সংঘবদ্ধ মানুষকে সংহত, অনুপ্রেরিত, উদ্দীপিত করাই ছিল সঙ্গীতের অন্যতম অভিপ্রায় ও লক্ষণীয় স্বভাব। মেহনতী মানুষের ইন্দ্রজাল বিশ্বাস শ্রমপ্রক্রিয়ার ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কলা শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। সঙ্গীতশিল্প জন্ম থেকে বহুকাল যাবত মেহনতী মানুষের হাতে ঐন্দ্রজালিক হাতিয়ার। ইদানীংকালেও লোকচর্যার সে স্বভাব সম্যক তিরোহিত নয়। প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার তাগিদে, যাবতীয় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করার হাতিয়ার হিসাবে অন্যান্য জাতের মত সঙ্গীত শিল্পও একদা সমগ্রের স্বার্থে প্রযুক্ত হত। ব্যক্তিবিশেষের নয়, যৌথ শিল্পরূপেই তদানীন্তন সঙ্গীতের আত্মপ্রকাশ। তার দক্ষিণ মুখের যাবতীয় দাক্ষিণ্য তাই সমগ্রের অভিমুখী। হেতু, উৎপাদনশীল মেহনত তখন মূলত যৌথজীবনভিত্তিক।

একদা সমাজ বিকাশের শ্রেণীহীন আদিম পর্যায়ে যৌথ স্পৃহা ছিল ঐকান্তিক ও সর্বৈব। এবং সে স্পৃহার মাধ্যাকর্ষণে সমকালের সমাজ সংগঠন ছিল অপেক্ষাকৃত সংহত ও বহুলাংশে সুস্থির। তৎকালে একক অবস্থান অপেক্ষা গুরুতর দুরদৃষ্ট মানুষের কল্পনাতীত ছিল। যূথবদ্ধতা তখন সর্বাত্মক ও অবিসংবাদিত জীবনচর্যা। একঘরে একাকীত্বের চেয়ে অধিক যন্ত্রণাদায়ক সেখানে আর কিছু ছিল না। সমষ্টিবিরোধী প্রবঞ্চক আত্মকেন্দ্রিকতা তখন নিতান্ত অভাবিত। যৌথতাই ছিল তদানীন্তন জীবনের সারমর্ম। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিসর্বস্বতা তাই মৃত্যুর নামান্তর। মেহনতী মানুষের শ্রমসঞ্জাত ভাষা ও ভাষাপ্রসূত ক্রিয়াকলাপ তখন সামাজিক জীবন ও শ্রমপ্রক্রিয়ার সংগঠন আর সংহতিবিধানের অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।[১৩] অতএব সেদিন বিবিধ প্রসঙ্গে ও প্রযুক্তিতে, ছন্দে-ভাষায়, সুরে-তালে সামাজিক ক্রিয়া হিসাবেই সঙ্গীত-শিল্পের দৃঢ় দৃপ্ত পদসঞ্চার।

তৎকালীন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সকলের সক্রিয় সংযোগ ও সমগ্রের যৌথ অধিকার ছিল অবশ্য স্বীকৃত। অধুনা প্রায় সর্বদেশেই সে আদিম সমাজ ব্যবস্থা বিলুপ্ত। শ্রেণীসমাজ ইদানীং একচ্ছত্র আধিপত্যের মধ্যাহ্ন গগনে। আত্ম-

ব্যক্তিকতা আজ নিঃসন্দেহে বিপুলায়তন। শিল্পের মৌল স্বভাবেও তাই ঘুণ ধরেছে। জীবনে যে ধ্বস বিস্তৃত ও ভয়াবহ, শিল্পও তার হাত থেকে স্বভাবত রেহাই পায় নি। পাওয়া অসম্ভব। জীবনে যখন সমষ্টিচিন্তার সমূহ বিপর্যয় তখন যাবতীয় শৈল্পিক অগ্রগতির সূর্যাস্ত অনিবার্য। শিল্পের ক্ষেত্রে যেখানে মৌল স্বভাবধর্মের এহেন বীভৎস অবক্ষয়, সেখানে শিল্প স্বল্পায়ু।

সাধারণ শিল্প প্রসঙ্গে প্রযুক্ত এ সিদ্ধান্ত সঙ্গীত সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সঙ্গীত জন্মগত স্বভাবের সূত্রেই সমগ্রকে উদ্দীপিত, অনুপ্রেরিত করার ঐন্দ্রজালিক হাতিয়ার। গান গেয়ে একদা মানুষ কৃপণ প্রকৃতির অবরুদ্ধ অনন্ত ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের দ্বার খোলবার চেষ্টা করেছিল। অনগ্রসর মানুষের অন্ন আহরণের উপায় হিসাবে সেদিন গান প্রযুক্ত হয়েছিল। তখনও বেদের জন্ম হয় নি।

অনেক পরে সংকলিত হলেও ভারতবর্ষের একাধিক উপনিষদ সঙ্গীতের আদিম পর্যায়ের স্বরূপ সম্পর্কিত ইঙ্গিতগর্ভ দলিল। কলাকৈবল্যবাদ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রথমাবধি তিরস্কৃত। "ক্ষুধার্ত, অন্ন আবশ্যক, অতএব গান গাও"—ছান্দোগ্যের এ বহুবিশ্রুত বর্ণনা তার নিদর্শন। আদিম মানুষের কামনা ছিল দুটি—শস্য ও সন্তান। শুধুমাত্র ছান্দোগ্য নয় অন্যান্য উপনিষদেও শস্যকামনা তথা অন্ন কামনা ও গান অবিচ্ছেদ্য। এবংবিধ বহু প্রাসঙ্গিক উদাহরণের কতিপয় প্রণিধানযোগ্য

(ক) অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়দ্, যদ্ধি কিঞ্চান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত-ইহ প্রতিতিষ্ঠতি।[১৪] [বৃহদারণ্যক, ১. ৩. ১৭]

(খ) তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদাত্মন-আগাসীরনু নোঽস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি।[১৫] [বৃহদারণ্যক, ১. ৩. ১৮]

দৃঢ় জাদুবিশ্বাস আর তীব্র কামনার আবেগে লোকসঙ্গীত সঞ্জীবিত। সমাজ বিকাশের আদিম পর্যায়ে এবং পরবর্তী কালেও কামনাহীন গানের অস্তিত্ব অলীক। কামনা চরিতার্থতার অভিপ্রায় সংযোগেই সঙ্গীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এখানেই প্রাচীন 'কামগান' কথার গুরুত্ব ও তাৎপর্য। কামনাকে সফল করার তাগিদেই তৎকালের যাবতীয় সঙ্গীত প্রয়াস।

মানুষ তার গানে স্তবে স্তুতিতে কল্পিত বিশ্ববিধাতাকেও প্রভাবিত করার প্রয়াসী। শক্তিমান বীরের মানবিক আদলে তাই দেবমূর্তি পরিকল্পিত। সে সর্বশক্তিমান বিশ্ববিধাতার স্থিতি কোন উর্ধ্বস্থিত স্বর্গলোকে নয়, ইহলোকে, মানুষের মধ্যে। শ্রমবীর কিংবা সর্বাত্মক নৈপুণ্যের অধিকারীই দেবতার

মর্যাদায় মণ্ডিত।[১৬] তারই কাছে শ্রমজীবী প্রার্থী মানুষের আবেদন। আর সে প্রার্থনাপূরণের মাধ্যম হিসাবেই গানের প্রযোগ। অতএব কামগান হোক আর সামগান হোক, সব গানেরই প্রাণকেন্দ্রে কামনার নিশ্চিত স্থিতি অনস্বীকার্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে এবংবিধ সিদ্ধান্তের সমর্থন সচরাচর। তদ্রূপ অনেক দৃষ্টান্তের কয়েকটি :

(ক) বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ য এতদেবং বিদ্বান বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।[১৭] [ছান্দোগ্য, ১. ২. ৩]

(খ) অন্নবানন্নাদো ভবতি, য এতান্যেবং বিদ্বানুদগীথাক্ষরাণ্যু পাস্তে·· ।[১৮] [ছান্দোগ্য, ১. ৩. ৭]

(গ) ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান ভবতি য এতদেবং বিদ্বান পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে।[১৯] [ছান্দোগ্য, ২. ৬. ২]

(ঘ) দুগ্ধহস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঃ অন্নবানন্নাদো ভবতি য এতদেবং বিদ্বান বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে।[২০] [ছান্দোগ্য, ২. ৮. ৩]

প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, বোধ ও বিশ্বাসকে পুরাপুরি পরিহার করে বহিরাগত ধর্মদর্শন কোন দেশের মাটিতেই বাচে না, বৃদ্ধি পায় না। এদেশের তথাকথিত আর্যীকরণেও যে সব লোকায়ত চর্যা স্বীকৃতি পেয়েছিল আর্যধর্ম-দর্শন সংক্রান্ত সংকলনের এবংবিধ বক্তব্য তারই নমুনা

সেকালে কথা আর গান ছিল সমার্থক। ছান্দোগ্য বর্ণিত 'উদ্গীথে'র ব্যাখ্যা তার প্রমাণ। 'উৎ' হল প্রাণ, 'গী'—বাক আর 'থম'-এর অর্থ অন্ন। প্রাণ, অন্ন ও গান বৈদিক উদ্গীথে পরস্পর সম্পৃক্ত ও একাধারে আশ্রিত। মানুষ মেহনত ও গান এখানে অবিচ্ছেদ্য। ছান্দোগ্যের সামগানে তাই শ্রুত হল ওম্ আদাম, ওম্ পিবাম।

যে শ্রম প্রক্রিয়া থেকে সঙ্গীতের জন্ম, মানুষের যৌথ জীবনে সংগ্রাম-সাফল্য সঞ্চার করাই ছিল তার ফলশ্রুতি। শ্রমপ্রক্রিয়া ও সমষ্টিগত মেহনতী মানুষকে সংহত করাই ছিল সঙ্গীতের অন্যতম অভিপ্রায় ও লক্ষণীয় স্বভাব। ব্যক্তি নয়, সমগ্র সমাজ সেখানে অভিন্নসত্ত স্বপ্নের দ্রষ্টা, একতম ভাবের আবেগে উদ্বুদ্ধ। ফলে সমগ্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ সক্রিয়তা সমকালের সঙ্গীতে প্রমূর্ত। সমাজবিকাশের সেই পর্বে লোকসঙ্গীত উৎপাদনের হাতিয়ার। সংঘবদ্ধ মেহনতী মানুষের এই জীবনসংগ্রামই যাবতীয় মানব সংস্কৃতির উৎস। গানেরও।[২১]

উৎপাদনশীল শ্রম প্রক্রিয়া মানব সংস্কৃতির স্বাভাবিক নিয়ামক প্রাচীন ছন্দোনামের সঙ্গে তাই জীবনের ও উৎপাদনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক।[২২] সমগ্র সমাজের জীবনযাত্রাকে সুস্থ, সহজ, নির্বিঘ্ন, সুন্দর করাই ছিল শ্রমজাত সঙ্গীতের অকুণ্ঠ প্রয়াস। সে প্রয়াসের চরিতার্থতায়ই ছিল তার সর্বার্থসিদ্ধি।

লোকসঙ্গীত সমানুভববিশিষ্ট দলবদ্ধ মেহনতী মানুষের লোকায়ত ভাব, ভাবনা ও জীবনবৃত্তের সাঙ্গীতিক প্রকাশ। মেহনতী মানুষের যৌথজীবনের এই মিশ্র শিল্প ব্যাপক গরিষ্ঠ শ্রেণীর সাধারণ আদর্শের বাহক। শ্রেণীহীন সমাজে সে সাধারণ আদর্শের স্বরূপ সবব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপীড়িত, শোষিত ও অবহেলিত শ্রেণীর প্রতিই লোকসঙ্গীতের নিঃসংশয় পক্ষপাতিত্ব। স্থান কাল নিরপেক্ষ ভাবে লোকসঙ্গীত শ্রমজীবী মানুষের সৃষ্টি। অতএব উৎপাদক শ্রম ও উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে তার সর্বকালের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। লোকসঙ্গীতে সে সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা যেমন প্রযুক্তিগত তেমনি প্রসঙ্গগতও। সমষ্টিগত গণমানুষের ধ্যান-ধারণা, কামনা-বাসনা প্রকাশের মাধ্যমরূপেই. লোকসঙ্গীত অদ্যাবধি অন্যান্য লোকবৃত্ত-পরিণামের মত সর্বাধিক সার্থকতার অধিকারী।

ইদানীং আমরা যে সমস্ত লোকসঙ্গীতের সাক্ষাৎ পাই, নগণ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত তার প্রায় সবগুলিই কৃষিযুগ এবং কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতি নির্ভর সমাজের সৃষ্টি। কৃষিনির্ভর সমাজের মানুষই মূলত তার স্রষ্টা। তজ্জন্য একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে কৃষিপ্রাধান্য, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে লোকসঙ্গীতের বিলুপ্তি অনিবার্য।

অধুনা এদেশে যাঁরা লোকসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতনামা তাঁরা মনে করেন লিখিত রূপ লোকসঙ্গীতের প্রাণধর্মকে কলুষিত করে, বিকৃত করে, তার সর্বনাশ সাধন করে। লোকসঙ্গীতের মৌখিক অলিখিত স্থিতির প্রতি সন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত করলে প্রধানতঃ যে সত্য স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় তা হল লোকসঙ্গীত প্রথমত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী অসাক্ষর মানুষের জীবনে মেহনতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতি-ক্রিয়া। লিখিত রূপায়ন প্রাপ্তির সম্ভাবনা তখন সম্যক অভাবিত। বস্তুত সেই জন্যই লোকসঙ্গীত একদা অলিখিত মৌখিক রূপ পেয়েছিল। অতএব লোক-সঙ্গীতের মৌখিক রূপকে তার বৈশেষিক লক্ষণ রূপে নির্দেশ করা যেমন অসঙ্গত ও অযৌক্তিক তেমনি কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির পরিসমাপ্তিতে লোকসঙ্গীতের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী—এ সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নয়।

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণ অন্যবিধ। অন্যান্য অনেকের মেহনতের ফল আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় একশ্রেণী যখন ক্রমশ ফুলে ফেঁপে বড় হয়ে উঠতে সুরু করল তখন থেকে মানব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা দিল শ্রেণী সংস্কৃতির সুরু। সক্রিয় হাতের দৌলতে মস্তিষ্ক ধীমান হয়, এবং মস্তিষ্কের সে ধী-ধারণা কর্মঠ হাতকে নিপুণ করে, পুনরায় হাতের সে নৈপুণ্যে মস্তিষ্কের ব্যাপকতর বিকাশ সাধিত হয়। এভাবেই মেহনতী গণমানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা অগ্রসর হয়। পরস্ব অপহারকের ব্যাপ্তি ও কর্তৃত্ব ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিনির্ভর সামন্তান্ত্রিক সমাজের তুলনায় কম নয়, বরং অধিকতর ব্যাপক ও বীভৎস। লোকসংস্কৃতির অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শাসক গোষ্ঠী তদীয় স্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন দেখে। ধনতন্ত্র সংস্কৃতিকে সমগ্র বিশ্বে তার শারীরিক ও নৈতিক আধিপত্য কায়েম করার প্রক্রিয়া হিসাবেই গণ্য করে।[২৩] ফলে লোকসংস্কৃতির যাবতীয় ধারায় বীভৎস বিকৃতি ও সংক্রামক অবক্ষয় দেখা দেয়। কিন্তু লোকসংস্কৃতির সমূহ বিনাশ সাধন বোধ হয় তাদের সাধ্যাতীত। কারণ ধনতন্ত্রই সমাজ বিকাশের শেষ কথা নয়। ধনতন্ত্রের বিকাশের মধ্যেই তার সর্বনাশের বীজও নিহিত। সংগ্রামী মানুষের হাতে শাণিত হাতিয়ার হিসাবেই তাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে লোকসঙ্গীতের স্থিতি।

যাঁরা বলেন, লোকসঙ্গীত সৃষ্টির পরিবেশ পরিস্থিতি অপগত, তাদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টি ভিন্নমত। লোকসঙ্গীতের সৃজনকাল ও পরিবেশ অপসৃত বলে যারা নিদেশনামা জারি করেছেন তাদের প্রধান যুক্তি হল, মানব সমাজের প্রকৃতিগত ঐক্য বিধানের ক্ষমতা ও সুসংবদ্ধ যৌথ চরিত্রের সমন্বয়-সূত্র, যা লোকসঙ্গীতের প্রাক্তন প্রসূতি, বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। অতএব তাঁদের সিদ্ধান্ত, লোকসঙ্গীত সৃষ্টির যাবতীয় সম্ভাবনা সভ্যতা বিস্তারের সংগে সংগে সম্যক বিনষ্ট হতে বাধ্য।

সমাজবাস্তবের সামনে এ জাতীয় যুক্তি অন্তঃসারশূন্য। লোকসঙ্গীত মানব-সংস্কৃতির বিবর্তন ধারায় অনশ্বর আয়ুর অধিকারী। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সুসংবদ্ধ সাম্য ও সমষ্টিগত ঐকচারিত্র্য নিঃশেষিত নয়। বরং শ্রেণীসমাজ অভিনব এক অবিভাজ্য শ্রেণীচরিত্র সমন্বিত। লোকসঙ্গীতের স্রষ্টারা যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, লোকসঙ্গীত সেই শ্রেণীর সাধারণ অভিপ্রায়ভিত্তিক। সুতরাং সমকাল সর্বাংশে সমষ্টিগত চরিত্র ও সংহতিভ্রষ্ট নয়। অতএব, লোক-

সঙ্গীত সৃষ্টির সম্ভাবনা ইদানীং বন্ধ্যা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য যে নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

ইদানীংকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রগতিশীল ঘোষণা, ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে দুনিয়ার মজদুর এক হও। শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব অধুনা সর্ববাদী সম্মতির অধিকারী। সে অধিকার ভূগোলের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। লোকসঙ্গীতের অধুনাতন সুসংবদ্ধ সংহত সমষ্টিপ্রবণতা আঞ্চলিকতাকে আত্মসাৎ করেও ভৌগোলিক সীমারেখায় সংকীর্ণ নয়। লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তি বহুলাংশে সবদা শ্রমের প্রকৃতি ও শ্রমেব সঙ্গে উৎপাদনের সমকালীন সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু শ্রমজীবী মানুষ লোকসঙ্গীতের অন্যতম স্রষ্টা, শ্রমজীবী মানুষের অনুভব ও আকাঙ্ক্ষার নিয়ামক শ্রমের প্রকৃতি স্বভাবত লোকসঙ্গীতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

অধুনাতন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংহত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত গণমানুষের ভাব-ভাবনা ও ঐকমানসিকতা স্বতন্ত্রসত্ত। আধুনিক মন ও মনন এক নতুন দর্শন, এক নয়া সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়াসী। সে দর্শন, সে সমাজ ব্যবস্থা ভাববাদ নিভর ঐশী অনুগ্রহজাত নয়, সৃষ্টিশীল সংগ্রামী মানুষের অপরাজেয় সংগ্রামের ফসল। সন্ত্রাস কিংবা ভযাবহ মাৎস্যন্যায অন্ধকারে তা আচ্ছন্ন নয, স্বাধীনতার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্মানতায় তা প্রভাস্বর। নয়া জমানার লোকসঙ্গীত তাই অসমসাহসিক পার্টিজান, যৌবনময় বিপ্লবীর, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী সৈনিকের নিশ্চিত জয়ের গৌরবগাথা। অধুনা লোকসঙ্গীত যান্ত্রিক বিকৃতি, ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা উদ্ঘাটিত করে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আশা ও অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করে সার্থকতা পায়। সামাজিক, রাজনৈতিক, সর্বোপরি অর্থনৈতিক বিপ্লবসাধনে সমর্পিতপ্রাণ জনগণের কণ্ঠ থেকেই আধুনিক কালের লোকসঙ্গীত নিঃসৃত। গণমানুষের ঐতিহাসিক চরিত্রগত পরিবর্তন অনিবার্যভাবে লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গ, প্রযুক্তি ও প্রকাশ-মাধ্যমের পরিবর্তন সূচিত করে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় লোকসাহিত্য বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর ও তার সহযাত্রী ক্রান্তিকামীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার সাঙ্গীতিক রসরূপায়ণ।

লোক-মানসিকতার মধ্যেও তারতম্য আছে। হেতু, সমকালীন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির তারতম্য। একদা ইন্দ্রজাল মনস্তত্ত্বে শস্য ও সন্তান উৎপাদন সমধর্মী চিন্তাসূত্রে বিধৃত ছিল। বিবিধ লোকায়ত

ব্রতানুষ্ঠানের গানে আজও তার নিদর্শন মেলে। মধ্যযুগের কৃষানির্ভর অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থায় প্রাধান্য পেয়েছে ঐহিক কামকেলি, আধ্যাত্মিক পারত্রিকতা। ধনিক-বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণের জীবনে যেমন ভাঙনের ধ্বস এনেছিল, তাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিকৃতির অবক্ষয় সংক্রামিত করেছে। আধুনিক কালে নানাবিধ জাতীয় সংকট, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দু'যুগের দুই ধারার দুটি গান উদ্ধার করে এ সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর বেহায়া বাবু কালচারের সর্বনাশা ব্যাধি বাংলা কবিসঙ্গীতের আঙ্গিকে কী পরিমাণ অবক্ষয়ের কলুষ সংক্রামিত করেছিল তদানীন্তন পক্ষীদলের গান তার নিদর্শন। রূপচাঁদ পক্ষীর একটি গান :

আমারে ফ্রড্ করে কালিযা ড্যাম্! তুই কোথায় গেলি।
আই য়্যাম ফর্ ইউ ভেরি সরি, গোলডেন বডি হল কালি ॥
হো মাই ডিয়ার ডিয়ারেস্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ '
ও মাই ডিয়ার ' হাউ টু রেস্ট, হিয়র ডিয়ার বনমালি ॥
পুওর ক্রিচর মিল্ক-গেরল্, তাদের ব্রেস্টে মারলি শেল,
নন্সেন্স তোর নাইকো আক্কেল, ব্রিচ-অব-কণ্ট্রাক্ট করলি ॥

এহেন অবক্ষয়ের উৎস তৎকালীন উচ্চবিত্তের বেহায়া বেলাল্লাপনা। ঈশ্বর গুপ্ত বর্ণিত পক্ষীসমাজের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা তার সাক্ষী :

"বাবু রামনারায়ণ মিশ্র মহাশয় পক্ষীর দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্বদায় উল্লাস করিতেন। পক্ষীর দলের পক্ষী সকলেই ভদ্রসন্তান ও বাবু এবং শৌখীন নামধারী সুখী ছিলেন। পাখীর দলেরা নিধুবাবুকে কর্তা বলিয়া অত্যন্ত মান্য করিত। পক্ষীগণ গাজার গুণানুসারে নাম পাইতেন। তাবতেই বাসা বাঁধিতেন, ডিম পাড়িতেন, আধার খাইতেন ও বুলি ঝাড়িতেন। যথা পক্ষীর বুলি :

ভীষণ, কিটি কিটি, কিস্ কিসিন্।
চুকু মুকু চুকু, চুক চুকুন।
কুকু রামশালিকে, কু, কু, গঙ্গা বিসং।...

...এমত জনরব যে এক ব্যক্তি পক্ষীদলে ভুক্ত হওনের অভিপ্রায়ে আসিয়া একাসনে বসিয়া উপরি উপরি ১০০ ছিলিম গাঁজা খাইলেন, কিন্তু এইমাত্র অপরাধ ও বীরত্বের হানি হইল যে ছিলিমটি টানিবার সময়ে একবার

একটুখানি খুক্-খুক্ করিয়া কাসিয়াছিলেন, এই লঘু দোষে পক্ষীরাজ তাঁহার নাম 'ছাতারে পাখী' রাখিলেন।"[২৩]

এহেন অবক্ষয়বিধ্বস্ত গানের পাশাপাশি এ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রমেশ শীলের একটি কবিসঙ্গীত উপস্থাপিত করছি। এ উপস্থাপনায় পরস্পর বিরোধী শ্রেণীসংস্কৃতি ও সে সংস্কৃতিভিত্তিক সঙ্গীতের পার্থক্য স্পষ্টতা পাবে।

চাষী ভাইরে চাষী ভাই, মজুর ভাইরে মজুর ভাই—
দেখছ নি ভাই চাষী-মজুর ধ্বংসের নমুনা ॥
পাকিস্তানের বার বছর গত হইযা গেল্।
ঢালা সুরু কবল তারা তেইল্যা মাথাত্ তেল ॥
একটা একটা করে চাওরে ভাই স্বাধীনতার গুণ।
ক্রমে ক্রমে খাজনা ট্যাক্স বাড়ে দশ বিশ গুণ ॥
জ্বালাইল অশান্তির আগুণ কার কি ওভাই অজানা।
চাষী-মজুর ধ্বংসের নমুনা ॥
পাকিস্তানে মানুষ বাড়ে কম পড়ি খায খানা।
বাতাস খাই নি বাচি রইয়ে সত্তের কোটী চীনা।
পোয়া হঅন বন্ধ হইলে পেটভরা ভাত পাইবা।
ঘরত্ বোই দিনে রাইতে জিন্দাবাদ গাইবা ॥
উন্ ত্রিশ রকম ট্যাক্স দিবা আর কিসের ভাবনা।
চাষী মজুর ধ্বংসের নমুনা ॥
মজুরের মজুরি করা আছে চিরকাল।
ভাতা বোনাস চাইলে মালিক চক্ষু করে লাল ॥
মজদুর ধর্মঘট করায় বুদ্ধি যদি লইব।
গুণ্ডাদলে ডাণ্ডা মারি ঠাণ্ডা করি দিব ॥
মাইর খাই ভূত হই যাইব তবুও তার কাদন মানা।
চাষী-মজুর ধ্বংসের নমুনা ॥
কি লাভ হইল বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা পাই।
কপাল মন্দ কারে কইঅম মানুষ একযোগ নাই ॥
একযোগেতে দাঁড়ায় যদি চাষী-মজুরগণ।
আকাশের চান্ মাটিত্ আনতে লাগে কতক্ষণ ॥
না করিলে দুঃখ বরণ সুখের আশা দেখি না।
চাষী-মজুর ধ্বংসের নমুনা ॥

লোকসঙ্গীত সামাজিক ইতিহাস ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্ক ও সংঘর্ষ-সংঘাতের বিশ্বস্ত দলিল। লোকবৃত্তের স্রোত পরিণামের প্রাণধারাতেই লোকসঙ্গীতের প্রবাহ প্রাণবান। সমাজ ব্যবস্থার মর্মকথা লোকসঙ্গীতে সর্বথা প্রকাশমান। অভিজ্ঞতার শ্রেণীচরিত্র লোকসঙ্গীতে স্পষ্ট। অনুভব ও মননের ক্ষেত্রে মানুষ আপন শ্রেণীচরিত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের যাবতীয় অভিজ্ঞতার স্থিতি তার শ্রেণীসংস্থানের প্রভাববৃত্তে। সুদূর অতীতের আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার সুসংবদ্ধ সমষ্টিচিন্তা স্বভাবত শ্রেণীসংঘাতের ফলে অনিবার্য নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। আদিম ঐক্যভাবনা অধুনা তাই শ্রেণীগত সমপ্রাণতায় রূপান্তরিত। এবংবিধ শ্রেণীচেতনার ভিত্তিতেই নয়া সমবায়-বোধের বাস্তবতা। ফলে মুক্তি সন্ধিৎসু সংগ্রামীর গান 'লা-মার্সাই' কিংবা 'আন্তর্জাতিক' একালের যথার্থ লোকসঙ্গীত।

শিল্পপ্রসারের দ্রুততাল গতি প্রাচীন সামন্ত সংস্কারজর্জর সঙ্গীতের প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তির নিশ্চিত তিরোধান ত্বরান্বিত করে। তা বলে এ কথা মনে করা যুক্তিহীন যে অধুনাতন ধনতান্ত্রিক সমাজে কিংবা অদূর ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ অথবা শ্রেণীহীন সমাজে লোকসঙ্গীত সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কৃষিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পরিবেশ যেখানে প্রস্থিত, তার ফলে সেখানে লোকসঙ্গীতের উৎস অবরুদ্ধ হয়ে যায়নি। কারণ লোকসাধারণের স্থিতি আদিম সাম্যযুগের অথবা সামন্ত-তান্ত্রিক দাসযুগের কালসীমায় সীমায়িত নয়। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানুষের বসবাস থাকবে, যতদিন মানুষের সৃজনী-কল্পনার অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন লোকসঙ্গীতের ধারাও প্রাণবন্ত থাকবে। শ্রেণীসমাজে পাণ্ডিত্যও শ্রেণীগত তাই কোন কোন পণ্ডিত মহলে এই লোকসঙ্গীত প্রচার সঙ্গীত রূপে বণিত হয়েছে।

একালের লোকসঙ্গীতে একচ্ছত্র আধিপত্য সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক বুদ্ধিজীবী মানুষের হেতু ওরাই আগামী ঐতিহাসিক বিপ্লবের সর্বাগ্রগণ্য সৈনিক ও অবিসংবাদিত নেতা। সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সংহত ও সুপরিচালিত করার অন্যতম মাধ্যমরূপেই অধুনাতন লোকসঙ্গীতের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি, প্রগতিশীল মানুষের এই বিশ্বাস ধারণা। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির শোষণ-সর্ব্বস্বতা ও সামন্তযুগীয় কুসংস্কার থেকে গণমানুষকে মুক্ত করার অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে লোকসঙ্গীত অধুনা এক অসামান্য ভূমিকায় অবতীর্ণ। সে মহান ভূমিকা পালনের পূর্ণতা প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মিদের উৎসুক প্রয়াস,

অক্লান্ত সাংগঠনিক কর্মোদ্যম, শ্রেণীসচেতন মানবকল্যাণমূলক তৎপরতার উপর নির্ভরশীল। লোকসঙ্গীতের এই চরিত্রকে বামঘেঁষা প্রচার সঙ্গীত বলে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা আপাতত এক শ্রেণীর ছাত্র শিক্ষক ও কর্মীর সমর্থন পেলেও ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় তা ভুল বলে প্রমাণিত হতে বাধ্য।

লোকসঙ্গীতের প্রতি উচ্চবিত্ত অভিজাত মহলের একটি উন্নাসিক বিতৃষ্ণা অদ্যাপি বিদ্যমান। অন্ধকারের মুখোমুখী আলোকের উজ্জলতা অনুধাবন যেমন সহজ, এহেন বিরূপ বিতৃষ্ণার সমীপবর্তী লোকসঙ্গীতের মাহাত্ম্যও তেমনি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান।

লোকসঙ্গীত গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পসৃষ্টি। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যেও তারতম্য আছে। শ্রেণীসচেতন সংহত জনগণের স্বতস্ফূর্ততার মধ্যেও তারতম্য আছে। শ্রেণী সচেতন সংহত জনগণের স্বতঃস্ফুততা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আদর্শহীন জনতার স্বতঃস্ফূর্ততা এক নয়। শ্রেণীসচেতনা মানুষের স্বতঃস্ফূতির প্রতিবন্ধক নয়। অতএব শ্রেণীচেতনা লোকসঙ্গীতের স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবকে নির্মূল করে না, তার নয়া রূপান্তর সাধন করে মাত্র। সে স্বতঃস্ফূতিকে দৃঢ় সংহত ও সুপরিচালিত করার কাল সমুপস্থিত। প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবপুঞ্জের অপচেষ্টা যুগে যুগে বারংবার লোকসঙ্গীতের বক্তব্য ও ও ভঙ্গিকে কলুষস্পর্শে কলঙ্কিত করেছে।

সামন্তযুগীয় কুসংস্কার, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতাকে ভস্মসাৎ করে অধুনাতন লোকসঙ্গীত বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত অগ্রগতিকে জোরদার করার উৎসুক প্রয়াসী। লোক সঙ্গীত সংগ্রামবিমুখ, আত্মকেন্দ্রিক, পলায়নী মনোবৃত্তি, হঠকারিতার কঠোর সমালোচনা, তীব্র প্রতিরোধ এবং সঠিক, সুস্থ, আপোসহীন সংগ্রামপ্রবণতার জয়গাথা। মানুষ যেমন প্রকৃতি পরিবেশকে পরিবর্তিত করতে করতে নিজে পরিবর্তিত হয়, লোকসঙ্গীতও তদ্রূপ সমাজপরিবেশ পালটানোর পবিত্র কৃত্যে তৎপর হয়ে বিবর্তিত হয়। এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে একই কবিয়ালের দু'কালের দুটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(১) প্রেম-নদীর দুই ধারা

এক ধারাতে বিষের পানি আর এক ধারা রসে ভরা ॥
যাহারা রস-সন্ধানী, গুরুর কাছে সন্ধান জানি,
প্রেম-নদীর ধারা চিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা
প্রেম-রসে আকণ্ঠ পুরে থাকে মাতোয়ারা।

যদি রাস্তা হারায় পীর ফিরে চায় মধ্যে মধ্যে দেয় ইশারা ॥
রসিক চৈতন্য-রসে হাঁসের মতন রসে ভাসে,
গোপন অমৃত চুষে কেহ পায় না সাড়া ;
গুপ্ত ধনের ধনী হয় সে ধনে ভাণ্ড পুরা।
তারা রস পিয়ে আর রত্ন তুলে রসিক সুজন ডুবালুরা ॥
নদীব ধারা না চিনে যে ধারায় বিষের পানি,
ঝাঁপ দিলে হয় প্রাণে হানি অকালে যায মারা,
গুরু ওঝা ঠিক থাকিলে মরিয়াও বাঁচে তারা।
রমেশেব কপালের ফেরে পেলাম না প্রেম-রসধারা ॥
—রমেশ শীল, ১৯১৮।

(২) সকল ব্যবসা বন্ধ এখন খোলা কেবল গুরুর দ্বার।
অল্পদিনে ব্যবসা জমে হইলে কয়জন কেন্বাচার ॥
গেরুয়ায আর দাড়ি চুলে ব্যবসার সাইনবোর্ড ঝুলে,
কেন্বাচার কয় কলিকালে অমন সাধু পাওয়া ভার।
কেন্বাচার কয় লোকের কাছে পাঁচ শ' তান শিষ্য আছে,
অমুকে মন্ত্র নিযেছে, অমুক দেশের জমিদার ॥
দেশে দেশে কেন্বাচ চালায, গুরুর কাছে কমিশন পায়,
কয় আমার গুরু মামলা জিতায, ছেলে হয় জন্ম-বন্ধ্যার ॥
বকবাজিত শিষ্য জোটায, মহোৎসবের চাঁদা উঠায়,
বৎসরান্তে বার্ষিক আদায়, ভিতরে শূন্য অন্তঃসার ॥
নিরীহ সরল যারা, এদের কাছে ঠকে তারা,
রাঙ কি সোনা পরখ করার শক্তি থাকে কয়জনার।
এই সব ভণ্ড সাধুর দলে দেশ দিল ভাই রসাতলে।
ভেবে তাই রমেশ বলে এদের হতে হুশিয়ার।
—রমেশ শীল, ১৯৫১।

প্রথাগত গুরুবাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিদূরিত করে রমেশ শীল শেষ পর্যন্ত সর্বহারা মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন :

রক্তমাখা লাল নিশান তুলে ধর মজুর কিষাণ
ঐ যে বাজিছে বিষাণ শুন শুন শুন।
কৃষক মজদুর মিলি করে কত গলাগলি
এই পতাকা রাঙাইলি দিয়ে বুকের খুন ॥

ঐ তোদের আগে আছে অন্তরীক্ষে নেচে নেচে
শিবরাম সমীরুদ্দীন যোদ্ধা সুনিপুণ।
তোরা দেশের বুদ্ধি বল তোরাই ভরসাস্থল
বুকের বলে এগিয়ে চল, বাণভরা তূণ॥
চাষী হিন্দু মুসলমান চটুলা মার বীর সন্তান
কবিকণ্ঠে মুখরিত তোমাদের গুণ।
তোমরা যত বঙ্গবীর তোল শির তোল শির
তোমরা নিভাবে দেশের অভাবের আগুন॥

প্রকৃতি-পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে করতে লোকশিল্পী তাঁদের জীবন ও শিল্পসৃষ্টিকে কিভাবে পরিবর্তিত কবেন, কবিযাল রমেশ শীলের জীবন ও গান তার উজ্জ্বল নিদর্শন। সামন্ততান্ত্রিক দাসপ্রথার কিংবা বুর্জোয়া শাসন-শোষণের প্রভাববৃত্তে লোকসঙ্গীতের অবক্ষয় অনিবার্য। সেই বন্ধনমুক্তির সাধনাই আজ লোকসঙ্গীত আন্দোলনের সর্বাগ্রগণ্য কর্তব্য। এ সাধনার পথে বিষয়বস্তুব পবিবর্তন আবশ্যম্ভাবী। বিষয়বস্তুর পরিবর্তন প্রথাগত আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত করবে। এহেন প্রাসঙ্গিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে লোকসঙ্গীতের নিশ্চিত বিনাশ, এবংবিধ অহেতুক সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। যেহেতু শোষিত শ্রমিকশ্রেণী ভৌগোলিক সীমায় সঙ্কীর্ণ নয়, তাই সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু ও আংগিকগত পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের লোকসঙ্গীত ভাবীকালে বিশ্বজনীন রূপান্তর গ্রহণ করবে। যাঁরা সমাজ-সংক্রান্তি অবিলম্বে বাস্তবায়িত করার জন্যে বদ্ধপরিকর ও নিরাপোষ সংগ্রামে সমর্পিতপ্রাণ লোক-সঙ্গীতের এই বিশ্বজনীন শ্রেণীসচেতনা ও রূপায়ণকে ত্বরান্বিত করার দায়িত্ব তাঁদেরই।

লোকসঙ্গীতের সাম্প্রতিক সমস্যা

গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ অদ্যাবধি সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার পরিণতি ছদ্মবেশী বর্গা, অধিযার, গোলামী, নানকার, আবওয়ার, বেগার, টংক প্রথায় শোষিত। তালুকদাব, এতরামনাব, জোতদার, মহাজন, জমিদার, মজুতদার, চোরাকারবারী প্রভৃতি সমাজশত্রুর চক্রান্তে তারা নিয়ত ক্লিষ্ট। অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকাব বিভ্রান্তিতে, সামন্ত-বুর্জোয়া চক্রের বহুবিধ আক্রমণে, মামলা-মকদ্দমা, ঘুষ ইত্যাদি দুর্নীতির যাতায় তারা অহর্নিশ নিষ্পিষ্ট। অবসন্ন গ্রাম বাংলার লোক-সংস্কৃতিব ধারক লোকসঙ্গীত শিল্পীরা সম্প্রতি গণমানুষের আবেগ অনুভবকে অভিব্যক্তি দেবাব দায়িত্ব গ্রহণ কবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। তাই তাঁদেব এ প্রয়াসের সংহতি ও সাফল্য বিধানের জন্যে লোকসঙ্গীতের সাম্প্রতিক সমস্যাবলীর স্বরূপ অনুধাবন অপরিহায।

আমাদের জাতীয় অগ্রগতির অন্তরায় হল সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা। বাংলা দেশের 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' আশা ও সুখের সঞ্চার করতে হলে প্রথম প্রয়োজন, গণমানুষের বিজযেব অভিযানকে ত্বরান্বিত কবা। সে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনের সহযোগী সাংকৃতিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ লোকসঙ্গীতের নির্ভুল সংহত সংগঠন বিপ্লবী সংস্কৃতিকর্মীদের একটি আশু কৃত্য।

একচেটিয়া শাসন ক্ষমতা ও পুঁজির অঢেল আর্থিক অনুকূল্যে সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদ চক্র ঘৃণ্য স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দাস সংস্কৃতির জঞ্জাল সৃষ্টি করে চলেছে। কুৎসিৎ যৌন লালসা, বিভ্রান্তিকর জ্যোতিষচিন্তা, অভিসন্ধিমূলক পারত্রিকতার জাল পেতে প্রতিক্রিয়াশীলরা সমাজ প্রগতিকে বানচাল করতে বদ্ধপরিকর। বিপ্লব বিরোধী অভিযানকে তারা মরিয়ার মত মদত দিচ্ছে। কিন্তু শোষিত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণও আজ আর নির্বাক দর্শক নয়। জীবনের বিরাট রঙ্গমঞ্চে আজ সবাই অভিনেতা।

অদ্যাবধি লোকসঙ্গীত প্রধানত গ্রামভিত্তিক। তাই তার প্রকৃতি ও প্রকরণে কৃষক অভ্যুত্থানের প্রভূত প্রভাব সর্বাধিক স্পষ্ট। জাতীয় জীবনের যাবতীয় উত্থান-পতন, আলোড়ন-অভ্যুত্থান লোকসঙ্গীতকে প্রভাবিত করে। উনিশ শ'

ছেচল্লিশের নৌ-বিদ্রোহ ও অন্যান্য গণ আন্দোলনের মত তেভাগা আন্দোলন ; নানকার, বর্গা, জমিদারী, টংক প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান আমাদের লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটা বিরাট অগ্রগতির সূচনা করেছে, অন্তঃসারশূন্য কুসংস্কার ও অশ্লীল খেউড়ের অর্গল ভেঙ্গে লোকসঙ্গীত সংগ্রামী রূপ নিয়েছে। পক্ষান্তরে লোকসঙ্গীতের এ অগ্রগতিও গণজাগরণে প্রেরণা সঞ্চার করেছে।

দেশের জনসাধারণ আশা করেছিল স্বাধীনতা লাভের পর তারা পেট-ভরে দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে, প্রয়োজনীয় পবিধানের জন্য আর দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে না, শ্রমিক শ্রেণী মনে করেছিল, কাজের অভাবে আর কাকেও বেকার থাকতে হবে না, পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য মিলবে, লে-অফ, ছাঁটাই, লক-আউট প্রভৃতি সমস্ত শোষণের হাত থেকে তারা রেহাই পাবে ; কৃষক শ্রেণী ভেবেছিল তারাই হবে জমির মালিক, ছাত্র সমাজ মনে করেছিল তারা অবাধ শিক্ষার সুযোগ পাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অফিসে কারখানায় ব্যাপক ছাঁটাই, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে জমিদারের ঋণভার লাঘবের কারসাজি, শিক্ষা সংস্কারের নামে শিক্ষা সংকোচের ষড়যন্ত্র, প্রগতিশীল গণপ্রতিষ্ঠানের কণ্ঠরোধ করে আমলাতান্ত্রিক শোষণ কায়েম রাখার দুরভিসন্ধি। কৃষিসমস্যা সংক্রান্ত গণ আন্দোলন বিভিন্ন কারণে 'কৃষকের হাতে জমি দিতে হবে' স্লোগান অতিক্রম করে 'কৃষকের জমি নিতে হবে' স্লোগানে উপনীত হল না। কিন্তু জনগণের মোহভঙ্গ ত্বরান্বিত হল।

এ সত্য অবশ্য স্বীকার্য, অন্যান্য শিল্প সাহিত্য ধারার মত লোকসঙ্গীতও শোষিত জনগণের বৈপ্লবিক অগ্রগতির, শ্রেণীহীন সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার শাণিত হাতিয়ার। এই শৈল্পিক আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে, লোকসঙ্গীতকে সংগ্রামী জনগণের শাণিত হাতিয়ারে পরিণত করতে হলে কয়েকটি দৃঢ়ভিৎ উপলব্ধির প্রয়োজন অপরিহার্য।

লোকসংস্কৃতির যথার্থ উত্তরাধিকারী ও নিশ্চিত ধারক একালের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাঁদেরই বিপ্লবী প্রয়াস লোকসঙ্গীতকে ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন সমাজে যথার্থ লোকবৃত্তে পরিণত করবে, সর্বমানবিক করে তুলবে। লোকসঙ্গীত একালের বিপুল সংগ্রামী জনগণের জন্যে। মুষ্টিমেয় শোষকের জন্যে জনগণের শিল্পকলা দাস সংস্কৃতির পথ অনুসরণে অস্বীকৃত। জনগণের স্বার্থে শোষকের বিনাশ সাধন করতে

লোকসঙ্গীত বদ্ধপরিকর। তাই সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী নীতির ভিত্তিতেই লোকসঙ্গীতের বিকাশ ও বিবর্ধনকে প্রাণবান করা প্রয়োজন।

বাংলার লোককবি এবং লোকশিল্পীবা লোকসঙ্গীতেব এ মূলনীতিকে সম্যক আত্মস্থ করতে এখনও সমর্থ হন নি। তাই আধা উপনিবেশিক দেউলিয়া শাসন ও শোষণের চাপে লোকশিল্পীরা প্রত্যহ নিপীডিত ও নিঃস্ব হযেও বিপথে পা বাডাবার আত্মকেন্দ্রিক অপচেষ্টা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হতে পারেন নি। দৃঢ সংহত সংগঠন ও অনুশীলিত শ্রেণী চেতনা সমৃদ্ধ শিক্ষণ প্রসারের মাধ্যমে লোকশিল্পীদের ধ্যান-ধারণা, বোধ ও বুদ্ধিকে নিষ্কলুষ কবার জন্য সংস্কৃতিকর্মীদেব অবিলম্বে তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীই গণতান্ত্রিক আন্দোলনেব ও ভবিষ্যৎ সমাজসংক্রান্তিব অবিসম্বাদিত নেতা তাই লোকসঙ্গীতও প্রধানত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে—প্রথমত শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে, দ্বিতীয়ত কৃষক শ্রেণীব জন্যে এবং তৃতীয়ত শোষিত মধ্যবিত্ত ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্যে।

অধুনা লোকসঙ্গীত একদিকে যেমন সমস্ত প্রকার শোষণ-শাসনের বিকৃত রূপ উদঘাটিত করে জনসাধারণকে উদ্দীপিত, অনুপ্রেরিত করবে অন্যদিকে তেমনি সংগ্রামী জনতার সুন্দর সুস্থ বিপ্লবী ধারার জয়গান করবে। উন্নত সৈন্যবাহিনী, প্রচুর মারণাস্ত্র এবং নিবিচার উৎপীডণের আশঙ্কা সত্ত্বেও আমাদের লোকসঙ্গীত শিল্পীরা শত্রুর জয়গানের মুখর হবে না।

গণ আন্দোলনের সমর্থনে, শ্রমিক-কৃষকের অধিকাব সংক্রান্ত অভ্যুত্থানের ফলে যারা জনগণের নেতৃস্থান অর্জন করেছেন, মৈত্রীস্থানীয় বলে পরিচিত হয়েছেন অথচ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী জ্ঞানের অস্বচ্ছতার ফলে কিংবা আপন শ্রেণীস্বার্থে অথবা ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে প্রতিক্রিয়াশীলতার পদলেহনে প্রবৃত্ত, বিপ্লববিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান লোকসঙ্গীত একদিকে যেমন তাঁদের সংগ্রামী ধারাকে প্রশংসিত করবে অন্যদিকে তেমনি সংগ্রাম বিমুখ পলায়নী মনোবৃত্তির সুষ্ঠ সমালোচনা করতেও ইতস্তত করবে না।

বিপ্লবী সংগ্রামের শরিকানাতেই লোকসঙ্গীত শিল্পীরা নিষ্কলুষ হবেন। বিপ্লবী ভাবাদর্শের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রামী মোর্চাকে সুদৃঢ সংহত করাই লোকসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

লোকসঙ্গীত বর্তমান বাংলা দেশে জনশিক্ষার প্রধান বাহনরূপে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন। বাংলা দেশের জনসাধারণের বিপুল বৃহদাংশ যেখানে অসাক্ষর সেখানে পুঁথিপত্রের সাহায্যে শিক্ষার প্রসারতাবিধান দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং দুঃসাধ্য। পুঁথিপত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান যেখানে অসম্ভব, নিছক তত্ত্বকথা যেখানে প্রত্যাশিত ফলপ্রসূ নয় সেখানে লোকশিল্পীরা সহজে সফল হতে সক্ষম। লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের, রমেশ শীলের কিংবা গুরুদাস পালের কবিগানে যখন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংঘাতসঙ্কুল জীবন সংক্রান্ত সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিষয়বস্তু পরিবেশিত হয়েছে সেখানে পল্লী-বাংলার অসংখ্য কৃষক ও কলকারখানার অগণিত শ্রমিককে রাতের পর রাত জেগে সে গণজীবনের, গণসংগ্রামের গান শুনতে দেখেছি।

সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদ শ্রেণীর শোষণ বিরোধী সমস্ত শিল্পীগোষ্ঠীকে অবিলম্বে একটি সংযুক্ত সংস্থায় সংঘবদ্ধ করা প্রয়োজন। যাদের জন্যে নতুন দিনের লোকসঙ্গীত, তাদের সম্পর্কে লোকশিল্পীদের সম্যক অবহিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। জনগণের সংগ্রামী জীবনের শরিক হয়েই জনগণকে জানতে হবে। জনগণকে জানার অন্য কোন সহজ সরল চোরাগলি নেই। শহরের শ্রমিক মধ্যবিত্তের শ্রেণীসংগ্রামের কাহিনী গ্রামের কৃষক ক্ষেতমজুর মধ্যবিত্তের কাছে উপস্থাপিত হোক, গ্রামের কৃষক ক্ষেতমজুর মধ্যবিত্তের সংগ্রামী জীবনের কথা শহরের শ্রমিক মধ্যবিত্ত জনসাধারণের দরবারে পেশ করা হোক, শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের মৈত্রী দৃঢ়ভিৎ হোক। গ্রামের ও শহরের লোকসঙ্গীত শিল্পীর সংযুক্ত সংস্থা সে বাঞ্ছিত ভবিতব্যের অন্যতম সেতুবন্ধ। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের মিছিল যখন সমাজ-সংক্রান্তির সন্ধিস্থল অতিক্রম করবে তখন এ সেতুর বুকেও তার নিশ্চিত পদচিহ্ন রেখে যাবে। এ পদচিহ্নের মহিমা মণ্ডনেই লোকসঙ্গীতের কৃতার্থতা। লোকসঙ্গীত লোকসাধারণেরই সংগ্রামী জীবনের রসভাষ্য।

অধুনা নাগরিক মধ্যবিত্ত লোকসঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠে যে সব তথাকথিত লোকসঙ্গীত প্রায়শ শ্রুতিগোচর হয় তার ভাষা না শহরের, না গ্রামের। জনগণের জীবন অনভিজ্ঞ সৌখীন মজদুরির ফলে এমন একটি সংকর ভাষার উদ্ভব হয়েছে যা নিঃসন্দেহে নিষ্প্রাণ। সুরও তদনুরূপ। যাদের জীবনের কথাকে কেন্দ্র করে এসব গানের আবর্তন তাদের জীবন সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অভাব বশত সুর ও কথার সার্থকতা এত সুদূরপরাহত। যথার্থ লোকসঙ্গীতকে

মৃত্তিকাঘনিষ্ট জীবনের ভাষা আয়ত্ত করতে হবে। নচেৎ লোকসঙ্গীত শিল্পীদের যাবতীয় সৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শ্রেণী সংগ্রামের পথ পরিহার করে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সাধ ও স্বপ্ন অলীক, অবান্তর। লোকসঙ্গীতকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করার জন্যে বর্তমান সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী সচেতনতা আয়ত্ত করা প্রয়োজন, শ্রেণীবিন্যাসের মূল তত্ত্ব এবং শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। সমাজ সংক্রান্তির ধারা, কার্যকারণ তাৎপর্য সম্পর্কে লোকসঙ্গীত শিল্পীদের স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু ধারণা একান্ত প্রত্যাশিত। অন্যথা অন্তসারশূন্য বিকৃত বাগাড়ম্বরে লোকসঙ্গীতের পর্যাবসান অবশ্যম্ভাবী।

সামন্ততান্ত্রিক দরবারে মন্দিরে শিল্পীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল না। নটী ও গণিকা ছিল সামর্থবোধক শব্দ। ধনীকশ্রেণীর কাছে সঙ্গীত শিল্প ব্যবসায়িক উপকরণ ও নিরাপদ মুনাফা অর্জনের সহযোগী মাধ্যম। গণআন্দোলনের নেতৃস্থানীয় অনেকের দৃষ্টিতে সঙ্গীত অদ্যাপি জমায়েত ও অর্থসংগ্রহের মাধ্যম মাত্র।[২৫] সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদ চক্রের শিল্পদৃষ্টি নিঃসন্দেহে তাদের শ্রেণীচেতনা-ভিত্তিক। কিন্তু গণআন্দোলনের নেতাদের ক্ষেত্রে সঙ্গীতশিল্পকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিযার হিসাবে না দেখাটা শ্রেণীস্বার্থবিরোধী বিচ্যুতি তো বটেই, পরন্তু অমার্জনীয় অপরাধও। শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শে যাঁরা দীক্ষিত, লোকসঙ্গীতকে কলাকৈবল্যের চক্রান্ত, সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধিমূলক বিকৃতি-বিধানের ষড়যন্ত্র ও অপঘাত থেকে মুক্ত করে শ্রেণীসংগ্রামের শাণিত হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব তাঁদেরই। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে, সঙ্গীতকে শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার করার জন্যে প্রয়োজন বৈপ্লবিক মনন। চিন্তার সঙ্গে শৈল্পিক রূপায়ন কৌশলের ঘনিষ্ট সংযোগ।

ভারবর্ষের মার্কসবাদী আন্দোলন নীতি ও কৌশলগত অস্থিরতার জন্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে প্রত্যাশিত পরিণতি দিতে সক্ষম হয় নি। ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘের জন্ম। লাল ফৌজের সামনে তখন ফ্যাসিস্ত বাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করছে। কলকাতার এক ডকমজুর শিল্পী রচনা করলেন 'লাল ফৌজনে সুরু কিয়া হ্যায় লাল ক্রান্তিকা জং' গানটি। ঋজু বলিষ্ঠ সুরের উদ্বেল আবেদন ও আন্তর্জাতিকতা বোধের প্রদীপ্তিভাস্বরতায় সে গান অসামান্য। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তখন গণনাট্য সংঘের অঙ্গনে এহেন শিল্পাঙ্গিক ও

আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শসমৃদ্ধ বক্তব্যের সম্মিলন ঘটেছিল। বোম্বাই প্রদেশের হরিজন শ্রমিক আন্নাভাও শাঠে[২৬] রচিত 'স্টালিনগ্রাদ পেয়াডা' ব্যালাড গান তার নিদর্শন। অসামান্য সার্থক সঙ্গীতশিল্পী মেটিযাবুরুজের মজুরেব ছেলে কবিয়াল গুরুদাস পালের[২৭] নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ পর্বের গণনাট্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভারবর্ষের সঙ্গীত স্রষ্টারা যেন 'শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক চেতনার চিরন্তন উৎস' Internationale বা 'আন্তর্জাতিক' রচযিতা ফরাসী বিপ্লবের সক্রিয় শরিক মেহনতী মজুর ইউজেন প্রোতিয়ার উত্তরাধিকারী।

অধুনা ভাবতের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবোধ যেমন স্তিমিত, গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লডাই যেমন অর্থনৈতিক দাবীর তলায় চাপা পড়েছে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তেমনি সর্বনাশা অবক্ষয় স্পষ্ট। এ বিকৃতির, এ অবক্ষয়ের আবম্ভ আজ নয়। শ্রমিক-কৃষক নেতৃত্বেব পরিবর্তে যখন বিপ্লবী আন্দোলনে আওয়াজ উঠল: গান্ধী-জিন্না এক হও, আর সেই আবর্জনা কুণ্ডে অবগাহন কবে গণনাট্য সঙ্ঘ গান ধরল: কংগ্রেস লীগ এক হও, হাত বেঁধে রও তখন থেকেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ মার্কসবাদী আন্তর্জাতিকতাবোধকে গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে থেকে অপসারিত করতে সুরু করেছে। তারই ফল হিসাবে গণনাট্য সংঘ কর্তৃক প্রচারিত কলকাতাব জনৈক বিডি মজদুর রচিত একটি গানের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য:

দরওয়াজেমে জাপান আ পৌছা
উঠ হুঁসমে আ—উঠ হুঁসমে আ।
গান্ধীকা কসম, জিন্না কসম
তলোয়াব উঠা, তলোয়ার উঠা ॥[২৮]

এ রাজনৈতিক অস্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিকতাবিরোধী স্খলনের প্রভাববৃত্তে লালিত চিন্তাধারা অনুসরণ করে ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের আমেদাবাদ সম্মেলনে প্রখ্যাত শ্রমিক গায়ক অমর শেখ ভারতীয় বুর্জোযা নেতাদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন কবলেন: ভারতসঙ্ঘকি দুর্দমবিজয়ী নেতা তুঝে প্রণাম। শ্রেণীচেতনাগত বিকৃতি গণনাট্যের নেতৃত্বে কী পরিমাণ আমলাতান্ত্রিক উন্নাসিকতা সৃষ্টি করেছিল কবিয়াল গুরুদাস পালের জীবনস্মৃতি তার বিশ্বস্ত দলিল। গুরুদাস পালের প্রাসঙ্গিক স্মৃতি:

কলকাতা সহর ঘুরছি আর চতুর্দিকে চং মং করে দেখছি। হাতের মুঠোর মধ্যে সযত্নে চেপে ধরে আছি কমরেড বিনয় রায়ের নামে লেখা কমরেড

নিত্যানন্দ চৌধুরীর সুপারিশপত্র। পি. সি. যোশীর নির্দেশে আমাকে আই. পি. টি. এ ইউনিটের সভ্য করে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। মনে আনন্দ আর ধরে না। অনেক, অনেক ঘোরাঘুরির পব, বহু লোককে বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর আই. পি. টি. এর রিহর্স্যাল ঘরের সন্ধান পেলাম। ঘরখানি বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দোতলার উপর একখানি হলঘর, আর তারই সংলগ্ন রিহার্স্যাল ঘর। হলঘরে ঢুকে দেখি, রিহার্স্যাল ঘরের দরজা তখন ভিতর দিক থেকে বন্ধ। বুঝলাম রিহর্স্যাল চলছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ১৫/১৬ বছরেব ছেলে। ছেলেটিকে খুব মিষ্টি করে বললাম, খোকা, আমি বিনয় রায়ের সঙ্গে দেখা করব। ছেলেটি হাত উঁচু করে ইঙ্গিতে আমাকে চুপ করতে বলল। ভিতরে রিহর্স্যাল হচ্ছে। আমি সভয়ে কাঁপাহাতে, কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরীর চিঠিটা দিয়ে ইশারায় বললাম, দয়া করে ভিতরে বিনয় রায়কে দিতে। ছেলেটিতো গ্রাহ্যই করল না—তারপর কি জানি কি ভেবে আস্তে আস্তে দরজা খুলে ভিতবে চিঠিখানা দিয়ে এসে বললে, বসুন। ভিতর থেকে আবার ঘডাং করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। যাই হোক, ওই রকমের জায়গায় বসার তো অনুমতি পেয়েছি, তাই বা কম কি? তাড়িয়ে তো দেয় নি? এদিক ওদিক তকিয়ে আয়নার মত তকতকে পালিশ করা চেয়ারে আর বসতে ভরসা হল না, বেঞ্চি টেঞ্চি নেই, ধপাস করে বসে পডলাম ঘরের কোণে সিমেণ্ট করা মেঝের ওপর। ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে নিল, বোধ হয় আমার পাডাগেঁয়ে কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসছিল। হাসুক, ও হাসি আর কদিনের?…নিজেই নিজের আঙুলগুলো মটকাচ্ছি আর ভাবছি এক কল্পরাজ্যের কত আজগুবি কাহিনীর কথা। বসে আছি তো বসেই আছি এক, দুই, আডাই ঘণ্টা। ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে তো বন্ধই রয়েছে খোলবার কোন লক্ষণ নেই। শেষে প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে হঠাৎ সশব্দে দরজা খুলে গেল, আমি আঁই করে চমকে উঠলাম। প্রায় ১৩/১৪ জন শিল্পী একসঙ্গে জটলা করতে করতে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আমি একটু নড়ে চডে বসলাম। উদ্দেশ্য, আমার উপস্থিতির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু হায় আশা মরীচিকা। অনেকের চোখ পডল বটে আমার দিকে, কিন্তু সে নিছক তাকানোর জন্যই তাকানো। তার বেশী কিছু নয়। সবাই গট্‌গট্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়লেন রাস্তায়। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে কেবলই কল্পনায় ভাবতে লাগলাম, পাতাল প্রবেশের পুর্ব মুহূর্তে সীতাদেবীর মনের

অবস্থার কথা। একটা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সটান চলে গেলাম কমরেড বিনয় রায়ের সামনে। হ্যাঁ, দেখুন, স্যার, বাবু, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে—ওহো, আপনার নাম ?—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম। নেহাত একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, হবে হবে, পরে খবর দিয়ে দেব, বলেই আবার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সটান চলে গেলেন। খবর তিনি যা দেবেন তা তাঁর কথার ভঙ্গীতে বুঝতে আমার আর বাকী রইল না। তখনকার দিনের আই পি. টি. এ. সম্পর্কে একটা অতি উচ্চ ধারণা এক মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। উঃ, মানুষকে এরা এত ঘৃণা করে ? এত নীচ মনে করে ? নাঃ—এই সোনার হরিণের পিছনে ছুটে আর লাভ নেই। এঁদের চেয়ে সেই কেরোসিন কুপী জেলে ছেঁড়া চ্যাটাইতে বসে যে বিড়ি শ্রমিক আড্ডা মারে তাঁদের অন্তঃকরণ অনেক বেশী উদার, অনেক বেশী মহান… ।'[২৯]

গণশিল্পী গুরুদাস পালের এ জবানবন্দী গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের উন্নাসিকতা ও বিপ্লবী শ্রেণী চেতনাগত বিচ্যুতির জলন্ত নজীর। শ্রেণী সংগ্রামে মার্কসবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের পদক্ষেপ অদ্যাপি দৃঢ় দৃপ্ত হল না বলেই লোকসঙ্গীতের বিপ্লবী ভূমিকা আজও অস্থির এবং প্রত্যাশিত পরিণতি থেকে দূরবর্তী।

সম্প্রদায়িকতা ও মেহনতী মানুষের স্বার্থবিরোধী যাবতীয় কুসংস্কার নির্মূল, নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রামে লোকসঙ্গীতকে প্রযুক্ত করার জন্যে প্রয়োজন নির্ভেজাল শ্রেণী-সমঝোতা নয়, শ্রেণীসংগ্রামের পথেই শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব—এ সিদ্ধান্তের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়েই সঙ্গীত বিপ্লবের ফল-প্রসূতা ও লোকসঙ্গীতে প্রত্যাশিত পরিণতি সম্ভব। সমাজসংক্রান্তি ও সঙ্গীত বিপ্লবের ইতিহাস পরস্পর বিরোধী নয়, সমধর্মী।

জগৎ ও জীবনভ্রষ্ট ধর্ম-সংস্কার ও ইহবিমুখ আধ্যাত্মিকতা বাংলা লোক-সঙ্গীতে বিস্তৃত বিষয়ের অধিকারী। আদিম সাম্য সমাজের পতনে সমাজ শাসন মুষ্টিমেয় স্বার্থপর শোষকের কুক্ষিগত হল। লোকসাধারণ সেখানে অবজ্ঞাত, শোষিত। সমাজের যাবতীয় সম্পদে শোষণপটু শাসকের স্বার্থপর কর্তৃত্ব জনিত বিপর্যয় নামল। বিশেষত শাসক যেখানে শ্রেণীশত্রু, শাসকের স্বার্থসিদ্ধি লোকশিল্পীর ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত, বাধ্যতামূলক হলেও কালক্রমে লোকশিল্পের অবক্ষয় ও বিকৃতির ব্যপকতা অবধারিত। বাংলা লোকসঙ্গীতের

ক্ষয়িষ্ণুতার কারণও তাই। লোকসাধারণের কথা লোকসাধারণের স্বার্থে শিল্প-রূপ না পেলেই এহেন ক্ষয়িষ্ণুতার দুর্লক্ষণ অনিবার্য।

প্রাচীন বলেই কিন্তু বাংলা লোকসঙ্গীতের যাতীয় আঙ্গিক আজও অকেজো হয়ে যায়নি। লোকবৃত্তের উত্তরাধিকারে যে আঙ্গিকের পুষ্টিবিধান, অবক্ষয়ের ধ্বস তাকে বিলুপ্ত করতে অসমর্থ। বাংলা লোকসঙ্গীতের অনেক আঙ্গিক অদ্যাপি গণজীবনের গান বহনে সক্ষম। বিকৃত বিষয়ের বলাৎকার নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু তার জন্যে যাবতীয় আঙ্গিক নস্যাৎ করা নিঃসন্দেহে হঠকারিতা। বিষয়বস্তুর তাগিদে নতুন আঙ্গিকের অভ্যুদয় অনিবার্য। কিন্তু বাংলার লোকবৃত্তের উত্তরাধিকারপুষ্ট আঙ্গিকের সঙ্গে বাঙালী জীবনের যোগ ওতপ্রোত। তাই এ জাতীয় মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ আঙ্গিক ও সংগ্রামী জীবনকথাব মিলনে নতুন লোকসঙ্গীতের কুমারসম্ভব অবাস্তব বিলাস নয়। বরং এবংবিধ মঙ্গলমিলন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বিপ্লবী ঐক্যবিধানের সহায়ক।

বাংলা লোকসঙ্গীতেব ধারা বিচিত্র, বহুমুখী। তার সমস্যা বহুবিধ। লোক-সঙ্গীতের সব ধারা একই স্তরে স্থিত নয়। সমস্যার তারতম্যও অতএব অবধারিত।

কবিগানের বিষয়বস্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সমতাল পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ায় প্রচলিত লোকসঙ্গীতের যাবতীয় ধারার মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী। কিন্তু অধুনা কবিগান বিচ্যুতিহীন, একথা অসত্য। বিচ্যুতি আছে বলেই আজও দ্রষ্টব্য, কবিয়ালরা যুক্তিকে জোরদার করার তাগিদে ধর্মীয় কুসংস্কারের জঞ্জাল থেকেই নানাবিধ নজির সংগ্রহ করেন। বাস্তবের অসংখ্য ঘটনা, শ্রেণীসংগ্রামের সংঘাত সংকুলতার প্রতি তাঁদের উদাসীনতা ও মারাত্মক দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে তাঁরা কতিপয় দারায় আধা-উপনিবেশিক শাসন শোষণকে সমর্থন করার পাকচক্রে দিশাহারা। উদাহরণ স্বরূপ 'সেকাল ও একাল'। 'একালে'র ওকালতি করতে গিয়ে প্রচলিত শোষণ ব্যবস্থার সাফাই অনভিপ্রেত। একথা অবশ্য স্মর্তব্য, একালকে সঙ্কীর্ণ, ভৌগোলিক অন্ধকূপের গণ্ডীতে আবদ্ধ করে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপরাধ অমার্জনীয়। 'সেকালে'র কবিয়াল যেমন নিপুণ বিচক্ষণতায় প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার দেউলিয়াপনা জনগণের সামনে তুলে ধরবেন, 'একালে'র কবিয়ালও তেমনি বুঝিয়ে দেবেন, প্রচলিত সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদ চক্র চালিত শাসন ব্যবস্থা একালের আদর্শস্থানীয় শাসনব্যবস্থা নয়, যারা মুক্তিকামী জনগণের আন্দোলনকে বর্বরতার বালি দিয়ে বন্দী করতে চায়, সম্প্রদায়িকতা-

প্রাদেশিকতার বিষে দেশকে জর্জরিত করার প্রয়াসী তারা সেকালের শাসকদেরই প্রতিনিধি।

সমস্যা কণ্টকিত সংঘাত সংকুল জীবনে ঘুমপাড়ানী গানের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী। ন্যাকামির পথে সঙ্গীতের অপমৃত্যু অনিবার্য। জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার পথ সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রজ্যবাদ চক্রের পথ। তাই তারা গণআন্দোলনকে যেমন বিভ্রান্তিকর প্রচার প্ররোচনায় বিকৃত করে, লোক-সঙ্গীতকেও তেমনি গণজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপমৃত্যুর পথে এগিয়ে দেয়।

সংগ্রামশীল গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে, উত্থান পতনের সঙ্গে একাত্ম-ভবনের মধ্যেই সঙ্গীতের মুক্তি, সঙ্গীতশিল্পীরও। এ গণমুক্তি আন্দোলনের পথে যথাবিহিত পদক্ষেপে পা চালাতে অসমর্থ হয়েছে বলেই যাত্রা, জারী, সারি, গাজী, ধামালী, কীর্তন, পাঁচালী প্রভৃতি গীতধারা আজ মরণোন্মুখ। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও অশ্লীল বিষয়বস্তুর কবল থেকে লোকসঙ্গীতের এ ধারাগুলির আশু মুক্তিবিধান আবশ্যক।

লোকসঙ্গীতে কথাবস্তুর সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বিধায়ক কথাবস্তু ইদানীং ইতস্তত পরিকীর্ণ। যে জমিদার-জোতদারী প্রথার শোষনের ফলে গ্রাম বাংলার অসংখ্য চাষী কালক্রমে জমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে, গ্রামকে গ্রাম উজার করে শহরে আসছে, উপার্জনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে রাস্তার ধারে অনাহারে অর্ধাহারে বেঘোরে শুকিয়ে মরছে এবং শেষ পযন্ত জীবনকে হাতে নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে লাঠিগুলি বেয়নেটের মুখে দল বেঁধে বুক পেতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে, এই সংগ্রামী গণমানুষের কথা ও কাহিনী কীর্তন, গাজী, পাচালী, আলকাপ, বোলান, গাজন প্রভৃতি ধারার মাধ্যমে উপস্থিত করা সম্ভব ও সঙ্গত। লোকসঙ্গীতের এ ধারাগুলি নতুন বিষয়বস্তু সমন্বিত হয়ে পরিবেশিত হলে সাধারণ মানুষ কি বিপুল আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে তার উদাহরণ বাস্তবে একাধিকবার দেখা গেছে। পুর্ববাংলার লোকশিল্পীরা এ সঙ্গীত-বিপ্লব স্থরু করেছিলেন কিন্তু পরিণতির পুর্বেই শ্রেণীশক্রর বীভৎস আক্রমণে পরিণত হওয়ার ফুরসৎ পায়নি। অতএব এহেন সঙ্গীত-বিপ্লবের জনপ্রিয়তা সংক্রান্ত বাস্তবতাবর্জিত তথাকথিত তাত্বিক কল্পনাবিলাসের কোন অবকাশ নেই। সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদ চক্র সৃষ্ট আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও প্রাদেশিকতা যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অপ-মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল, আমলাতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ফলে যে লক্ষ

লক্ষ মানুষ বেকার হল, শিক্ষক ভিক্ষুকে পরিণত হল, ছাত্রসমাজের আশা-অকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ বেপরোয়া স্বৈরাচার ও বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেল, নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় যে অসংখ্য শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত বিপন্ন হল এমনি অজস্র জীবনের অগণিত সংঘাতকে এ সব লোকসঙ্গীতধারার কথাবস্তু করে তুলতে হবে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই থেকে সুরু করে ইদানীংকালের জমি ও খাদ্যের আন্দোলনে যে সমস্ত মৃত্যুঞ্জয় বীর শহীদের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের কাহিনীকে কেন্দ্র করে কীর্তন-গাজী অনায়াসে নতুন রূপ পরিগ্রহ করুক। নতুন-পুরাতনের এবংবিধ বিপ্লবী সাংস্কৃতিক মিশ্রণ একান্ত প্রত্যাশিত। শ্রমজীবন ও ও জীবনসংগ্রামের বিচিত্র প্রবাহ থেকে সংগৃহীত হবে নতুন দিনের নতুন গানের ছন্দ ও সুর।

লালন ফকির, গগন হরকরা, দুর্গা কৈবর্তের গান থেকে দিন বদলের পালার কুশীলব লোকসঙ্গীত শিল্পীরা শুধু সুর সংগ্রহ করবেন না, অন্ধ ভাবানুসৃতিতে তাদের কৃত্য সীমাবদ্ধ তো থাকবেই না; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জমিদার-জোতদার, ধনিক-বিরোধী সন্ন্যাসী, ফকির তথা কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে দিনমজুর লালন ফকিরের শ্রমজীবনের কথা, গগন হরকরার সংঘাতসংকুল সমস্যা কণ্টকিত হরকরা জীবনেব কাহিনীও নতুন দিনের বাউল, ভাটিয়ালী, মারফতী, মুর্শীদি, বেদে, ছড়া ও গাথায় একাত্ম হোক। এহেন একাত্মতার মধ্যেই সংগ্রামী লোকজীবনের প্রতিনিধিত্বের বাস্তবতা।

নির্লজ্জ পরস্বাপহারী, চ্যাংড়া চোরাবাজারীর পয়সায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্থ উন্মার্গগামীর বিকৃত জীবন দর্শন ক্ষয়িষ্ণু সঙ্গীত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্ধনের উৎসস্থল। গণসংগ্রামের বিপ্রতীপেই তাদের স্থিতি। যতক্ষণ না পর্যন্ত লোকসঙ্গীত শিল্পীরা শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের স্বার্থে গণআন্দোলনের সক্রিয় শরিক হয়ে উঠছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে বাঙ্ময় করতে অসমর্থ। শ্রেণী ও সমাজসংক্রান্ত দ্বন্দ্বমূলক মনন চিন্তার অভাবজনিত অজ্ঞতা সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদ চক্র প্রবর্তিত শিল্পরীতি আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু তাঁদের যথার্থ প্রগতিচিন্তাকে ব্যাহত করবেই।

জনগণের বিচিত্র ব্যাপক সংগ্রামক্ষেত্র থেকে যে শিল্প নিয়ত জন্ম নিচ্ছে সে শিল্পের মূল্যই সমধিক। গণসংগ্রামের সক্রিয় শরিক লোকসঙ্গীতশিল্পীই লোক-সঙ্গীত আন্দোলনে নেতৃত্বের অধিকারী। তাঁরাই বিপ্লবী লোকসঙ্গীত

আন্দোলনকে পরিচালিত ও পরিশীলিত করতে সক্ষম। প্রতিবিপ্লবী সাংস্কৃতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিপ্লবী লোকসঙ্গীত আন্দোলন শাসকের দণ্ড, শোষকের পৈশাচিক হস্তকে উপেক্ষা করে, অকর্মণ্য করে সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদ চক্রের আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত হতে সুরু করেছে। এই লোকসঙ্গীত আন্দোলনের জয় সুনিশ্চিত।

ইদানীং শহুরে শৌখীন মহলে পল্লী-সঙ্গীত পরিবেশনের প্রসার পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে শ্রেণী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল ধর্ম ও যৌনতার প্লাবনে মানুষের সুস্থ বুদ্ধি ও সংগ্রামী চেতনাকে নিস্তেজ করতে তৎপর তাদের অধুনাতন প্রীতি-বিধায়ক পল্লীসঙ্গীতগুলি লক্ষ্য করলে মনে হয় পল্লীগীতি সর্বৈব আধ্যাত্মিকতা-কেন্দ্রিক কিংবা যৌন আবেদনমূলক। প্রাচীন কাল থেকে বাংলার পল্লীগীতির ক্ষেত্রে যে অন্য একটি সুস্থ স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহমান তা এই একচক্ষু তৎপরতার ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ অনুপস্থিত। সে প্রগতিশীল ধারাকে সুসংহত ও সুপরিচালিত করা যাদের কর্তব্য তারাও অদ্যাপি নিশ্চেষ্ট। অথচ এই অবহেলিত ধারাটির সঙ্গেই গণ-মানুষের উত্থান পতনের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

শিল্প-সাহিত্য মানুষের বৈপ্লবিক অগ্রগতির, সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠার শাণিত হাতিয়ার। শাসকের স্বৈরাচারী অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, সামাজিক অন্যায়-অনাচারের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ গণ-মানুষের কণ্ঠস্বর বাংলার পল্লীসঙ্গীতে বারংবার গর্জন করে উঠেছে। বাংলার শিল্পে সাহিত্যে তার নিদর্শন বিরল নয়। চর্যাগীতি থেকে সুরু করে অদ্যাবধি বাংলার বিভিন্ন পল্লীগীতিতে জনগণের বিক্ষোভ কখনও প্রত্যক্ষ প্রতিবাদে, কখনও পরোক্ষ বিদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে চর্যাগীতি, প্রাকৃত পৈঙ্গল প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থের গীতিগুলি রচিত হয়েছিল। বাংলা দেশে তখন সেন আমল। বাংলার সামন্ত রাজারা তখন পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিবাদে লিপ্ত। তৎকালীন বাঙ্গালী জনসাধারণ অবাঙ্গালী সেন রাজাদের বরদাস্ত করতে নারাজ। কৌলিন্য প্রথার বিভেদ সৃষ্টি করেও সে বিমুখতার হাত থেকে সেন রাজারা সম্যক রেহাই পান নি। তাঁদের নিজেদের মধ্যও শেষ পর্যন্ত তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। চতুর্দিকে অব্যবস্থারও অন্ত রইল না। শাসন ও শোষণ তখন মাৎস্যন্যায়মুখী। অবশেষে মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ। সব মিলিয়ে লোকসাধারণের মনে জাগল শাসক বিরোধী বিক্ষোভ আর সমাজের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তৎকালীন দেববাদ ও আধ্যাত্মপ্রবণতার মধ্যেও তার চিহ্ন

দুর্লভ নয়। চর্যাগীতিতে, প্রাকৃতপৈঙ্গলে, বজ্জালগ্‌গে তার প্রমাণ বিধৃত। তার কতিপয় প্রমাণ নিম্নে উদাহৃত হল:

১

রাআ লুবধ, সমাজ খল,
বহু কলহারিন, সেবক ধুত্তউ।
জীবন চাহসি সুক্খ জই
পরিহর ঘর জই বহুগুণ জুত্তউ॥[৩০]
[—প্রাকৃতপৈঙ্গল]

২

তং কিং পি সাহসং সাহসেন সাহন্তি সাহসসবভাবা।
জং ভাবিউন দিব্বোপরম্‌হো ধুসই নিয়সীসং॥[৩১]
[—বজ্জালগ্‌গ।]

৩

বলদ বিআত্রল গাবিয়া বাঁঝে
পিটা দুহিএ এ তিন সাঝে।...
জো সো চোর সোই দুষাধী
নিতি নিতি ষিআলা ষিহেঁ যম জুঝঅ।...
[—চর্যাগীতি]

এই চর্যাগীতিটির কবীর ভণিতাঙ্কিত হিন্দি-বাংলা রূপান্তর:

অব কেয়া করে গান গাঁব কতুআলা
স্ব মাংস পসারি গীধ রাক্ষউআলা।
মুখ কী নাও বিলাই কাঁড়ারী
শোএ মেড়কু নাগ পাহারী।
বলদ বিয়াওএ গাভী ভই বাঞ্ঝা
বাছুরি দুয়াওএ দিন তিন সাঞ্ঝা।
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে...[৩২]

শাসক এবং আরক্ষবাহিনীর শোষণ ও উৎপীড়ন-অসহিষ্ণু সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক বিরূপতা একাধিক চর্যার রূপকারোপে স্পষ্ট। শাসনতান্ত্রিক

অব্যবস্থা ও সামাজিক স্বৈরাচারের ডামাডোলে কোতোয়ালও অপহারক। ‘জো সো চৌর সেই দুষাধী’। অতএব, যাবতীয় অবাঞ্ছিত অস্বাভাবিকতা অনিবার্য। আরক্ষবাহিনীর দোর্দণ্ড প্রতাপ সর্বত্র, শুল্ক-সংগ্রাহকেরা ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে ডাইনে-বাঁয়ে। তারই অন্তরালে যন্ত্রণাজর্জ্জর জীবনের যাত্রাপথ, সংকীর্ণ কানাগলি।

বামে দহিণে গুম ঘাট
ভণই কাহ্নূ অন্তরালেঁ বাট ॥[৩৩]

[—চর্যাগীতি]

ধর্মাশ্রয়ী ও গুহ্যযোগাশ্রিত পারত্রিক প্রবণতার মধ্যেও বিকলাঙ্গ গোঁড়ামি, পরাক্রান্ত শাসকের নিগ্রহ ও শোষণের বিরুদ্ধে লোকসাধারণের আক্রোশ চর্যাগীতির প্রতীক-পরিকল্পনায় ও রূপকারোপে পরিস্ফুট।

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, জাতীয় জীবনের যাবতীয় উত্থান-পতন, আন্দোলন-অভ্যুত্থান পল্লীকবির মনকে যখনই নাড়া দিয়েছে তখন তাঁরা সংগ্রামী মানুষের স্বপক্ষে সঙ্গীত রচনা করেছেন। সতীদাহ-প্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন থেকে সুরু করে ইদানীংকালের খাদ্য আন্দোলন পর্যন্ত কোন বিষয়েই তাঁরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় নির্বিকার নন। লোকসাধারণের সংগ্রামী জীবনের শরিক হিসাবে তাঁরাও অগ্রসর হয়েছেন। উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

(১) সতীদাহ প্রথা নিরোধের সমর্থনে ঃ

শোন শোন শোন সবে নরনারীগণ,
সহমরণ পেরথা নারী বধেরই কারণ।
নারী হত্যে মহাপাপ, শাস্ত্রের বচন ;
নারী রক্ষে মহাকর্ম মহৎ কারণ।
ওগো সতি, স্বামী মরলে তোমাদের চিতেয় যেতে হয়,
তোমরা মরলে পুরুষ ত’ কেউ সঙ্গেতে না যায়।
সতী গভ্ভে রেখে সন্তান যদি স্বামী চলে যায়,
বল কোন দোষে নরশিশু যাবে যমালয়।
খুন করলে শুনি খুনী ফাঁসিতে লটকায়—
জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারলে জেনো নরকগামী হয়।

তাই কলির রাম রামমোহন দিয়েচেন ডাক,
নারীবধ রোধ তরে বাজাও সবাই ঢাক ॥
[—বয়াতীর গান : পুর্ববঙ্গ]

(২) ফুড কমিটির (food committee) কর্মকর্তাদের অনাচারের বিরুদ্ধে :

শোনরে বলি কাইল চাচা বরিশালের খবর খাসা
ফুড কমিটির প্রিসিডিংরে জোতার মালা গলায় দিয়া ঝুলাইছে রাস্তায়।
আবার নতুন খবর পাওয়া গ্যাছে
ও তার রেশন কাড গলায় বাইন্ধ্যা চিনি এট্টু হাতে দিয়া
কেরাসিন ছ্যায় মাথায়,
আবার নতুন কাপড় দিয়া গলায় টান্যা বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়,
বলি উচিত সাজা অইল এতকাল, চাচা উচিত সাজা ॥
[—কিষাণী গান : পুর্ববঙ্গ]

(৩) মন্ত্রী-মিশনের সুপারিশের প্রতিবাদে :

বাপরে বাপ্ জান বাঁচান হল দায়,
শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, নলখাগড়ার প্রাণ যায়।
জান বাচান হল দায় ॥
ধন্য ব্রিটিশরাজের চাল, ও যে করলে নাজেহাল,
শেষে মাথার ঘায়ে পাগল হয়্যা উড়জাহাজে হাওয়া খায়।
বাপরে বাপ জান বাঁচান হল দায় ॥
চার্চিল ছদ্মেরই বেশে (ও সে) অট্টালিকাতে বসে চপ কাটলেট চুষে,
এটলীকে ফের কেটলী বানায়্যা সেই জলেতে চাহা খায়।
বাপরে জান বাঁচান হল দায় ॥
[—গম্ভীরা : মালদহ]

(৪) বঙ্গ-বিহার বিরোধের কালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য ও বাংলা ভাষার দাবীতে এবং খাদ্যের জন্যে :

ও তুই চলে যা মানে মানে,
রইতে নারি তোর অনাচারে।

অনাহারে লোক মরিল হুড়াপঞ্জার গ্রামেতে,
এক কলমেই লিখে দিল সবাই ভিখারী বটে।
মাতৃভাষার টুঁটি টিপে উঠাল আদালতে,
তাইতো এখন চায় না রে মন অনাচারে রহিতে ॥

টুস্থ লো কি দশা হবে,
আমাদের কথা বললে দিগার গারদ ঘরে নিয়ে যাবে।
এড়েং বেড়েং বইল্লে তবে অরা আমাদের ছাইডিবে ॥
ও লো কি দশা হবে?

শুন রে বিহারী ভাই—
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ দেখাই।
তোরা আপন পরে ভেদ বাড়ালি বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড় বাংলা বিহার বুদ্ধিটাই ॥

বাঙ্গালী বিহারী সবাই এক ভারতের আপন ভাই।
বাঙ্গালীকে মারলি তবু বিষ ছড়ালি হিন্দি চাই ॥
বাংলা ভাষার দাবীতে ভাই কোন ভেদের কথা নাই।
এই ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে মাতৃভাষার রাজ্য চাই ॥

[—টুস্থ গান : মানভূম]

(৫) স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অব্যবস্থা ও উৎপীড়ণের প্রতিবাদে :

একি উল্টা বাতাস এল রে ভাই উল্টা বাতাস এল,
মাউন্ট ব্যাটনী স্বাধীনতায় পথে বসাইল ॥
স্বাধীন হলাম সাত বছর আচ্ছা সুখবর।
আর্ধাহারে অনাহারে মানুষের প্রাণ গেল ॥
যারে করিতে বর্জন কত প্রাণ বিসর্জন।
এত তর্জন গর্জন করেও সে ঘরের কোন রইল ॥
যত শিল্প কারখানা দুষমণে চালায়।
দেশের লোক ত খায় আর ঘুমায় না জানি কি হইল ॥
যত সাদা চামড়ার দল, রক্ত-শোষার কল।
ভাগ-বণ্টনে দেশের ভাই মোর তার সঙ্গে মিশিল ॥

এ দেশের ভাই আমার সাদার তাঁবেদার।
আইন সভায় হয়ে মেম্বার যমদণ্ড চালাইল ॥
যদি পেটের রুটি চাই, লাঠির বাড়ি খাই।
আর কতক্ষণ থাকলে দাঁড়াই' গুলি চলে এল ॥
শোন যত বন্ধুগণ, সবে হও সচেতন।
কর এ দুর্নীতি পরিবর্তন, নয় ত ভাই দেশ গেল ॥

[—রমেশ শীলের গান : পূর্ববঙ্গ]

(৬) বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রতিবাদে :

বন্দনা : আসবেতে খাড্যা হয্যা বন্দিম এ লোক কাক ?
দেশের হালৎ দেখ্যা হইচুরে অবাক।
মরি হায়রে কলিকাল,
বেরুবাড়ী দিবা নাগে নাগ্যাছে কাচাল।

সমবেত : বেরুবাড়ী দিম্ না,
মুই বেরুবাড়ী দিম্ না।
মূল গায়েন : বেরু দিম্ বাড়ী দিম্,
বেরুবাড়ী দিম্ না।
দোহার : বেরুবাড়ী দিম্না।
মূল গায়েন : জান দিম্, পান দিম্, বেরুবাড়ী দিম না।

[—রংপাঁচালী : জলপাইগুড়ি]

(৭) স্বর্ণ নিয়ন্ত্রন আইনের (১৯৬৩) প্রতিবাদে :

ও আমার দ্যাশের কথা বলব কি তা শোনরে সাধু ভাই—
ও হেথায় বুদ্ধিমানের রাজত্বেতে বলার কিছু নাই।
ও ছিল সোনার অলঙ্কার, ও তায় পিতল দিয়ে দেয়,
সোনা-রূপো কেড়ে নিয়ে পিতলে চোখ ধাঁধায়।
বলব কি আর ভাই ॥
কত লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিল সোনার কারিগর,
নয়া আইনে কাবু হইয়া হইল দিগম্বর।

বেকার হইল কর্মকার, হইল শরীর চর্মসার,
ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া আর্সেনিকে দেয় চুমুক ;
অধম নিবারণ কয় বিনয় করি সরকার মশাইর চোখ খুলুক :

[বয়াতীর গান : পশ্চিম বঙ্গ]

(৮) ১৯৬১ সালে বোলানের তারিখ ছিল চৌদ্দই এপ্রিল। একুশে মার্চ থেকে দশই এপ্রিল পর্য্যন্ত সমগ্র বাংলা দেশ খাদ্য আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেই আন্দোলনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত বোলানের গানে পল্লীকবিরা তাঁদের সংগ্রামী সমর্থনের স্বাক্ষর রেখেছে।

অভাব অনটন হইল যে এবার সারা বাংলাময়।
দিনের দিন যে দর চড়ে গো যায় গরীব দুঃখীর প্রাণ বাঁচান দায়।
কলিকাতা বসিরহাটে কৃষ্ণনগর আসানসোলে খাদ্যের দাবী জানায় রে।
পেটের জ্বালা বড় জ্বালা তাই জানাতে গেল যে রে।
হাতী ঘোড়া বড় জানোয়ার তাদের ক্ষুধা নাই।
গাছপালা আর যে ছোলা কত খেতে পায়॥
ওদের ভাবনা নাই জানাই সবারে।
আবার লোক দেখানো কাঁচা কলা খাই যে বলে রে॥
বসিরহাট কৃষ্ণনগরে বন্দুক গুলি কাঁদুনে গ্যাস কত ছোড়ে,
গুলির তাড়নায় নাবালকের প্রাণ যায়

স্কুল-ছাত্র হিন্দু-মুসলিম দুটি জনারে॥

ও ভাই গরু মেরে জুতা দান যে করে।
শোকের বার্তা পাঠায়, আহা মরে যাই, ছেলের বাবার ঘরে॥
দুটি প্রাণ চলে গেল, হরতাল দারুণ হল সারা বাংলা জুড়ে।
অফিস কাছারি বাস টেরামগাড়ী দাউ দাউ করে জলে শুন রে॥
কলেজ স্কুল ছাত্রছাত্রী সকলে দাঁড়ায় রে বুক পেতে দাঁড়ায়।
আবার রেলের গাড়ী আগুন জলে গার্ড পালায়ে যায় রে

গার্ড পালায়ে যায়॥

আধপেটা খেয়ে কেন মরি, দেখিব এবার, বলে দেখিব এবার।
মন্ত্রের সাধন না হয়গো শরীর পতন, হবে ছারখার॥

খপরের কাগজে শুনি আরো কত কি।
গদী ছাড হে বিধাতা বাংলাতে তুমি।
মরিব মরিব মোরা, মরা-কামড দিব।
বাছাধনের নাড়ীভুঁড়ি চিবায়ে সব খাব ॥

[—বোলান : বর্ধমান]

(৯) কর্ডনিং ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে :

দিনমজুর দুঃখীজনের কথা মোরা কিছু বলতে চাই।
এ দুর্দিনে সারাদিন খেটে গোটা দুই টাকা উপায় করে ভাই।
চুনোপুঁটি বলে তারা এক কেজি চাল
গামছামোড নিয়ে যায় গো গঙ্গাপারে।
অমনি গঙ্গার বালিচরে গলায কাপড দিযে ধরে।
বস্তা বস্তা চাল চলে যায দেখতে পায না বে।
চোখে তখন ছানি পডে রূপচান্দি মাবার তরে ॥
সত্য ঘটনা মোরা জানাই সবারে।
মনিবাবুর বাগান দিযে রাত দুটায় যায় রে ॥
মরা ঘাটে ডিউটি করে শীতের রাতে ওরে মরাটে ঘরে।
চা বিস্কুট সিগারেট আর খায় লেবুনেট, কিয়া মজাদার দেখো,
রূপচান্দির তরে ॥

যখন চায়ের মজলিস ঐ ঘরেতে চলে।
পিঁপডের সারির মত চালের বস্তা যত গঙ্গাপারে চলে ॥
রুইকাতলার কাছে কভু না যায় রে গোপনে পকেট বোঝাই করে।
গরীব জন হলে পিঠের চামডা তোলে হায় রে ॥
চোখের সামনে কালোবাজারে কত হয়ে যায় রে, কত হয়ে যায।
আবার বলতে গেলে ধনী জনে চোখ রাঙিয়ে কয় রে,
চোখ রাঙিয়ে কয় ॥
বড বড হারগিলে ধনী গিলে খেতে চায়, তারা গিলে খেতে চায়।
গলায় কাঁটা বাধবে যখন গো টেনে ছেঁড়া হবে বিষম দায় ॥

[—বোলান : কাটোয়া]

উদ্ধৃতির আধিক্যে গ্রন্থের মেদবাহুল্য অবধারিত। এতএব অলমিতি বিস্তরেন। অনতিবিস্তার সত্ত্বেও পল্লীসঙ্গীতের এ ধারাটি ও তার সংগ্রামী লোকস্বভাব স্পষ্ট।

যে শিল্প মানুষের বৈপ্লবিক অগ্রগতির হাতিয়ার, সে শিল্প শতকরা পাঁচ জনের জন্য নয়। যে পঁচানব্বুইজনের হিতার্থে এ শিল্প, তাদের অধিকাংশ অদ্যাবধি সাক্ষর নয়। তাই পত্র পত্রিকা ও বিচিত্র গ্রন্থাদি সেখানে প্রায় নিষ্ক্রিয় বললে অত্যুক্তি হয় না। তাদের মধ্যে পল্লীগীতির মাধ্যমে শিক্ষা ও সংহতি বিস্তারের প্রয়াস সর্ব্বাধিক ফলপ্রসূ। অধুনা পল্লীগীতিকে সংহত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করার কাল সমুপস্থিত। প্রত্যেক প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীর পবিত্র দায়িত্ব এ ব্যাপারে অবিলম্বে তৎপর হওয়া।

পল্লীগীতি তথাকথিত আঙ্গিকের দিক থেকে খুব উন্নত নয়, একথা সত্য। তৎসত্ত্বেও অসাধারণ জনপ্রিয় এই পল্লীসঙ্গীতগুলোকে উপেক্ষা করা অনুচিত। স্বৈরাচারী মূলধনের উৎপীড়ন, জমিদার মহাজনের অত্যাচার, একনায়কত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষায় তৎপর বিশ্বাসঘাতক দুর্বৃত্তদের সেবাদাসত্বকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে অমসৃন হলেও পল্লীসঙ্গীতকে সন্তানের মত সস্নেহে লালন করতে হবে।

শিল্পবাহিনী সেনাবাহিনীর মত। জেনারেল যেমন একা যুদ্ধ জয় করতে পারেন না, যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে নিম্নতম পর্যায়ের একজন সাধারণ সৈনিকের মূল্যও যেমন অবশ্য স্বীকৃত, শহরের স্বনামধন্য উচ্চমানের শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নিম্নতম পর্যায়ের একজন পল্লীগীতিকারের মূল্যকেও অবশ্য স্বীকার করতে হবে। আন্দোলনের দিক থেকে পল্লীকবির মূল্য বরং এদেশে অধিক। কারণ সমাজবাস্তবের দিক থেকে একথা সপ্রমাণ যে তাঁরাই অধিকাংশ মাটিঘেঁসা মেহনতী জনজীবনের অধিকতর কাছাকাছি। কৃষিপ্রধান এদেশে পল্লীকবিরা সংহত ও সুপরিচালিত হলে সমাজ সংক্রান্তি ত্বরান্বিত হবে। শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পীর সমবেত প্রয়াসে বিচিত্র অভিজ্ঞতার যে লেন-দেন ও ঐক্য সংঘটিত হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার মূল্য নিঃসন্দেহে নগন্য নয়। এ হেন যৌথ তৎপরতা অনলস শ্রমসাধ্য। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে তা নিশ্চয় হয়। ইচ্ছে মানে অবিচল নিষ্ঠা, সচেতনতা, আর পরিকল্পিত তৎপরতা।

পাদটীকা

১. ...the decisive step was taken : *the hand had become free* and could henceforth attain ever greater dexterity and skill, and the greater flexibility thus acquired was inherited and increased from generation to generation.

Thus the hand is not only the organ of labour, *it is also the product of labour.* —Frederick Engels : Dialectics of Nature, p. 281.

২. Labour is the source of all wealth, the political economists assert. It is this—next to nature, which supplies it with the material that it converts into wealth. But it is also infinity more than this. It is the primary basic condition for all human existence, and this is to such an extent that, in a sense, we have to say : labour created man himself.

—Frederick Engels : Dialectics of Nature (Moscow 1954), p. 228.

৩. The mode of production in material life determined the social, political and intellectual life processes in general. It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness.

—Karl Marx : Selected Works, Vol. I, p 356.

৪. ...the development of labour necessarily helped to bring the members of the society closer together by multiplying cases of mutual support, joint activity and by making clear the advantage of this joint activity to each individual. In short, men in the making arrived at the point where *they had something to say* to one another...

First labour, after it and with it speech—these were the two most essential stimuli under the influence of which the brain of the ape gradually changed into that of man, which for all its similarity is far larger and more perfect.

—Frederick Engels : Marx-Engels Selected Works (1962), Vol. II, p. 82-84.

৫. ...the animal merely *uses* external nature, and brings about changes in it simply by his presence ; man by his changes makes nature serve his ends, *masters* it. This is the final, essential distinction between man and other animals and once again it is labour that brings about this distinction. —ibid, p. 89.

৬. The mastery over nature, which begins with the development of the hand, with labour widened man's horizon at every new advance. He was continually discovering new, hitherto unknown, properties of natural objects. On the other hand, the development of labour necessarily helped to bring the members of society closer together by multiplying cases of mutual support, joint activity, and by making clear the advantage

of this joint activity to each individual. In short, men in the making arrived at the point where they had something to say to one another. The need led to the creation of its organ; by modulation the undeveloped larynx of the ape was slowly but surely transformed for ever more developed modulation, and the organs of the mouth gradually learned to pronounce one articulate letter after another.

Comparison into animals proves that this explanation of the origin of language from labour and together with labour is the only correct one.

—Frederick Engels : Dialectics of Nature (Moscow 1954), p. 232.

৭. First labour, after it, and then with it, articulate speech—these were the two most essential stimuli under the influence of which the brain of the ape gradually changed into that of man, which for all its similarity to the former is far larger and more perfect. Hand in hand with the development of the brain went the development of its most immediate instruments the sense organs. .. The reaction on labour and speech of the development of the brain and its attendant senses, of the increasing clarity of consciousness, power of abstraction and of judgment, gave an ever-renewed impulse to the further development of both labour and speech.

—Frederick Engels : Dialecties of Nature (1954) pp. 233-34.

৮. H. A. Junod : Life of a South African Tribe (1927), Vol. II, p. 284.

৯. R. F. Burton : The Lake Regions of Central Africa (1860), pp. 361-62

১০. K. Buecher : Arbeit und Rhythmus (1896), p. 235.

১১. পাল্কীর গান : কাব্য সঞ্চয়ন (১৩৭২) : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৬।

১২. শ্রী সলিল চৌধুরীর সুর সংযোজিত 'পাল্কীর গান'।

১৩. I have in view the striving of working men of ancient times to ease their labour, raise productivity, arm themselves against enemies, both quadruped biped, and also to exert an influence on the hostile natural elements by means of the spoken word, by 'spells' and 'invocations.' The latter fact is of particular importance, since it shows how profoundly men believed in the power of the spoken word this faith stemming from the obvious and tangible advantages provided by human speech, which organises man's social life and labour process. —Maxim Gorky : On Literature, p. 230.

১৪. তারপর গান করে নিজের জন্যে অন্নাদি লাভ করলেন। কারণ যে সব অন্ন ভুক্ত হয় তা এতদ্বারা ভুক্ত হয়, এর মধ্যেই তার অবস্থান।

১৫. সেই দেবতারা বললেন, এতাবৎ যাবতীয় অন্ন গানের দ্বারাই নিজের জন্য লাভ করেছ। এখন আমাদের সে অন্নের অংশভাগ কর।

১৬. They even tried to influence the gods through 'invocations.' This was quite natural, since all gods of the antiquity lived on earth, bore the image of human beings and behave as such; they favoured the obedient

and frowned upon disobedient as human beings are. The fact that the gods were anthromorphous goes to show that religious thinking did not spring from a contemplation of the phenomena of nature but sprang from the social struggle. .. In the imagination of primitive men, a god was not an abstract conception or a fantastic being but a perfectly real figure equiped with some implement of labour, skilled in one trade or another, and man's instructor and and fellow-worker.

—Maxim Gorky: On Literature, pp. 230-31.

১৭. যিনি যথোক্ত জেনে বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন তাঁর জন্যে মেঘ বর্ষণ করে ও তিনি বর্ষণ করাতে সমর্থ হন।

১৮. যিনি এমন জেনে উদ্গীথের অক্ষরগুলোকে উপাসনা করেন তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন।

১৯. যিনি সামকে এমন জেনে পশুবিষয়ে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করেন পশুগুলো তাঁর ভোগার্হ হয়, তিনি পশুসম্পত্তি সম্পন্ন হন।

২০. যিনি তাকে এমন জেনে সপ্ত সামের সবাক উপাসনা করেন তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন। তাঁর জন্যে বাক্য স্বয়ং বাক্যের দুগ্ধ দোহন করে অর্থাৎ বাক্যের যা প্রদানযোগ্য সারবস্তু বাক্য তা প্রদান করে।

২১. The three arts of dancing, music and poetry began as one. Their source was the rhythmical movement of the human bodies engaged in collective labour.

—George Thomson : Studies an Ancient Greek Society (1949) p. 451.

২২. গায়ত্রী—জীবন রক্ষার উপায়, গঙ্গা। বৃহতী—শস্যবিশেষ। চট্টগ্রামী উপভাষায় 'বিরতা বাইগন' হল ক্ষুদ্রাকার তেতো বেগুন। পংক্তি—ক্ষেতের আল। উষ্ণিক—উড়কি ধান। ত্রিষ্টুপ—শিঙা, ঘণ্টা, ধানকাটার গান (?)। জগতি—'জগদযোনি'—কুমারসম্ভব ২.৯ (গরু ?)।

২৩. The bourgeoisie have never harboured any urge towards cultural creativity, if the latter be understood as something more than simply a constant development of external and material living comforts and the development of luxury. The culture of capitalism is nothing but a system of methods aimed at extending and consolidating the bourgeoisie's physical and moral rule over the world, over men and women, over the treasures of the earth, and the forces of nature. *The bourgeoisie have never understood the meaning of cultural development as the need for progress for the entire mass of humanity.* —Maxim Gorky : On Literature, p. 233.

২৪. সংবাদ প্রভাকর, ১২৬১।

২৫. P. & T-র একটি ইউনিয়নের নিমন্ত্রণপত্রের অংশ বিশেষ: We hope that as in the past we shall not fail to have your sympathy and patronage in the humble effort to make a success of our 'smile for a day' programme in these days of hardships and distress.

—শ্রমিক শ্রেণী ও সংস্কৃতি: হেমাঙ্গ বিশ্বাস (গণনাট্য)।

২৬. এলাহাবাদ সম্মেলনে আন্নাভাও শাঠে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২৭. গুরুদাস পাল বহুবার প্রমাণ করেছেন যে গণসমাবেশে তিনি আমাদের চেয়ে বড় শিল্পী। —শ্রমিক শ্রেণী ও সংস্কৃতি : হেমাঙ্গ বিশ্বাস (গণনাট্য)।

২৮. শ্রমিক শ্রেণী ও সংস্কৃতি : হেমাঙ্গ বিশ্বাস (গণনাট্য)

২৯. জীবন ও শিল্প : গুরুদাস পাল (গণনাট্য, জানুয়ারী, ১৯৬৯)।

৩০.
লুব্ধ রাজা সমাজ খল,
ঝগড়াটে বৌ, শঠ সেবক।
সুখ যদি চাও এই জীবনে
বহুগুণের ঘরটি ছাড়ো॥

৩১.
যারা সাহসিক সাহসভরে
কখন যে তারা কি জানি কি করে—
তাই ভেবে ভেবে চিন্তায়-জর্জর
মাথা নাড়ে দৈব, মুখ ফেরায় অন্তঃপর।

৩২.
কেমন ধারা গানটি এখন করছে গ্রামের কোতোয়াল।
মাংস বিলোয় কুকুরগুলো ভাণ্ডারী তায় শকুনদল।
ইঁদুরগুলোর পানসাতে আজ মাঝি মাল্লা সব বিড়াল।
বেঙেরা সব ঘুমায় আর সাপগুলো তার চৌকিদার।
বলদ বিয়োয় গাইরা বাঁঝা তিন বেলা দুধ দেয় বাছুর।
সিংহ সনে তুমুল লড়াই চলছে নিত্য ঐ ফেরুব।

৩৩.
ডাইনে বাঁয়ে সেপাইখানা আর মাস্তুলের উজুল-ঘাটি।
আড়াল ঢাকার চলায় সড়ক—এখন কাঙ, রহেন খাঁটি।

লোকচর্যা

রাঢের পৌষ আগলানো

পরোপজীবী সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীস্বার্থের একনিষ্ঠ রক্ষক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রাহাজান সংস্কার-লালসা বাংলা দেশের মৌলিক লোকচর্যাকে কৌলীন্যের লোভে লিপ্ত করে ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে কুলটা করেছে। ফলে কুলীন কুলটা লোকচর্যার বিকৃত বর্তমানে তার প্রাক্তন শ্রী একেবারে বেওয়ারিশ। ইদানীং সে চর্যা না বেদ না ব্রত অবস্থায় ন যযৌ ন তস্থৌ গতি।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রসাধনে অবলিপ্ত লোকচর্যার রঙচটা মুখোশের মিছিলে কতিপয় অনুষ্ঠানে অদ্যাপি কিয়ৎ পরিমান রুদ্রললিত বিধ্বস্ত প্রাক্তনের সাক্ষাৎ মেলে। রাঢের 'পৌষ আগলানো' তন্মধ্যে অন্যতম। পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠান একান্তভাবে কৃষিনির্ভর মানুষের লোকায়ত ব্রতানুষ্ঠান, ফসলের প্রার্থনা-উৎসব।

রাঢ অঞ্চলে পৌষ আগলানোর পদ্ধতি বহু-বিচিত্র। অভিজাত সম্প্রদায় পৌষের শেষ সন্ধ্যায় গোবরের গুলি পাকায়। কেউ কেউ গোবরের মূর্তি তৈরি করে। গুলি হোক আর মূর্তি হোক, নামে অনন্য—পৌষ বুড়ি। মেয়েরা প্রতি ঘরে এক একটি পৌষ বুড়ি স্থাপন করে। এক একটা খড় বাঁ-দিকে আড়াই পাক পাকিয়ে তা দিয়ে পৌষ বুড়িকে বেষ্টন করে। বাঁদিকে পাকানোর মধ্যে হয়তো এ অনুষ্ঠানে নারী প্রাধান্যের সংস্কার-সংকেত নিহিত। তারা পৌষ বুড়ির উপর তুলসীর মঞ্জরী পুঁতে দেয়। কেউ বা দুটো করে পৌষ বুড়ি ঘরের দরজার উপর দু'দিকের দেওয়ালের গায়ে আটকে রাখে।

অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনভিজাত সম্প্রদায়ের পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠানেই যে শুধু পার্থক্য আছে তা নয়। অনভিজাত সম্প্রদায়ের পৌষ আগলানোর পদ্ধতিগত স্বাতন্ত্র্যও প্রচুর। এ গাঁয়ে ও-গাঁয়ে, এমনকি

এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় পৌষ আগলানোর আনুষ্ঠানিক স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। এক বাগ্দী সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ অনুষ্ঠান বিভিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যে বাগ্দীরা ব্রাহ্মণ পাড়ার বাসিন্দা তারা পৌষের শেষ সন্ধ্যায় বকনা গরুর গোবর দিয়ে পৌষ বুড়ি তৈরি করে। পৌষ বুড়ির উপর তুলসীর মঞ্জরী, ধনে-জিরের শীষ রোপণ করে। খড়ের বেষ্টনী দিয়ে পৌষ আগলায়। আলো জ্বালে। পরদিন উষার আলো-আঁধারে পৌষ বুড়ি বিসর্জন দিয়ে স্নান করে। স্নান সেরে শুষনী-কলমী শাকের শীষ আর জলভরা ঘট নিয়ে এক দৌড়ে ঘরে ঢোকে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চীৎকার করে: 'পৌষ পালালো, পৌষ পালালো; আগল দে, আগল দে'। ঘরের সব দরজা এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায়। পৌষকে ধরে রাখার ব্যাকুলতায় তারা গান গায়:

এসো পৌষ যেও না।
জন্ম জন্ম ছেড়ো না॥
পৌষ যায় গুড়ি গুড়ি।
পৌষের মাথায় চালের ঝুড়ি॥

অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ গান প্রচলিত। অনভিজাতদের কোন কোন বাড়িতে আবার ব্রাহ্মণ আসে। পুজো হয়।

রাঢ়ের হাড়ি বাগ্দী মুচি বায়েনদের মধ্যে যেখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের রীতি ও পদ্ধতি গৃহীত হয় নি, সেখানকার পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে লোকায়তিকতা সর্বাধিক প্রকট।

ধনুর তূণর শেষ মকরর যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখ ভোগ॥

এ তিনদিনের শেষ দিন পৌষ-সংক্রান্তি। দু'দিন আগে থেকেই ওরা উৎসবে মাতে।

পৌষ আগলানো লোকায়ত ব্রতানুষ্ঠান। স্বর্গলাভ এখানে কাম্য নয়। ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষাও এখানে শালপ্রাংশু হওয়ার অবকাশ পায় নি। যৌথ স্পৃহাই পৌষ আগলানো অনুষ্ঠানে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। পৌষ আগলানোর উৎসব যখন থেকে এদেশে প্রচলিত হ'ল শ্রম-বিভাজন তখনও বোধ করি বিভাগ-বৈষম্যে সম্যক বিকশিত হয়ে মানুষকে শ্রেণীবিভক্ত করেনি।[১]

দৃঢ়সংবদ্ধ আদিম সমাজের সমষ্টি প্রবণতা থেকেই এ উৎসবের বিকাশ ও

বিবর্ধন। এ অনুষ্ঠান সমগ্র সমাজের। কৃষিনির্ভর সমস্ত সমাজটাই এখানে সচল। করণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে এটা মুখ্যত কৃষি উৎসব।

পৌষ আগলানোর উৎসব প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। মার্ক্সীয় দর্শনে ধর্ম হল অত্যাচারিতের মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস, নির্দয় দুনিয়ার করুণ ক্রন্দন, ভৌতিক জীবনে চৈতন্যের মোহ।[২] তাই লোকায়ত উৎসব আত্মন্তর আশায় উদ্দীপিত মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান। সেচ্ছাচারী ইচ্ছার জোরে প্রকৃতিকে বশীভূত করার প্রয়াসেই ইন্দ্রজালের মায়াবী কৌশল কলার প্রয়োগ। ইন্দ্রজালে বৈজ্ঞানিক অসচেতনতা আছে, কিন্তু নির্দয় দুনিয়ার অত্যাচার জর্জর মানুষের মর্মান্তিক হা-হুতাশ নেই। বাস্তবকে বশ করার জন্য মানুষ সেখানে বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামে লিপ্ত।[৩]

পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠানে অদ্যাপি মেয়েদের নির্বিবাদ একাধিপত্য। এজাতীয় কৃষিসংক্রান্ত উৎসবে নারীর অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রাচ্যের মাতৃপ্রধান পৌরাণিক ধর্মতন্ত্র ও ধর্মীয় আচরণ পদ্ধতির অন্যতম উৎস ও স্মারক।

সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে যেমন পুরুষ নারীর সহযোগী হিসাবে বিবেচিত হয়, তেমনি পৌষ আগলানো-সগোত্র উৎসব অনুষ্ঠানে পুরুষেরা নারীর সহযোগী মাত্র। মনুর বিধান অনুসারে অভিভাবকের বিনানুমতিতে মেয়েরা ব্রতপালনে অনধিকারী। কুমারী কন্যার ক্ষেত্রে পিতার, বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে স্বামীর, বিধবাদের ক্ষেত্রে পুত্রের অনুমতি মনুর মতে অত্যাবশ্যকীয়। স্মার্তপ্রবরের নির্দেশ লোকচর্যার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রশ্রয় পায় নি। লোকায়ত ব্রতানুষ্ঠান নারীজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ব্রতানুষ্ঠানের জন্যে তারা কারো অনুমতির তোয়াক্কা করেনা।

নারীই কৃষি আবিষ্কর্ত্রী। ক্রমবিবর্তনের পথে পুরুষের হাতে কৃষির হস্তান্তর সত্ত্বেও কৃষি অনুষ্ঠানের বিবিধ অধিকার অদ্যাবধি নারীর হাতে। এক সময় পুরুষরা শিকার ও পশুপালনের কাজে ব্যাপৃত ছিল এবং নারীরাই কৃষিকাজ করতো। নারী সন্তানধারণে সক্ষম। অতএব সে উর্বরতার প্রতীক। নারীর প্রজননক্ষমতা প্রকৃতির ক্ষেত্রে জনন-ক্ষমতা সঞ্চারিত করবে, এ ধারণার বশবর্তী হয়েই গ্রীক, জুলু থেকে শুরু করে বহু জাতির কৃষক সম্প্রদায় নারী-জননাঙ্গ প্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতো। রবার্ট ব্রিফল্ট, ডব্লু. হাণ্টার ও জর্জ টমসন ফসল-কামনায় অনুষ্ঠিত নরনারীর প্রকাশ্য মৈথুন ও অবাধ যৌন মিলনমূলক অনুষ্ঠানের অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ

করেছেন ।[৪] ভাবানুষঙ্গবশত জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কামনায় অনুষ্ঠিত যাবতীয় যাদুর অনুষ্ঠান নারীর অবিসম্বাদিত এক্তিয়ারে ছিল । জমির উর্বরতা-কামনা কিংবা কৃষি উৎসব-অনুষ্ঠানের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়াই ছিল মানুষের বংশবৃদ্ধি-প্রয়াসে পরিকল্পিত ক্রিয়া-কলাপের অনুকৃতি । অনগ্রসর কৃষি সমাজের দুই মূল কামনা শস্য ও সন্তানকে কেন্দ্র করে এবংবিধ লোকচর্যার উদ্ভব ও সম্প্রসারন। দুই কামনার প্রয়াস ও পরিকল্পনা এখানে একাকার। ওরাওঁদের কৃষি-উৎসব সরহুলের শেষে প্রত্যেক বছর পাহান ও পাহানাইনের অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের সঙ্গে গ্রাম-প্রধানের স্ত্রীর নতুন করে বিবাহ দেওয়া হয়। এ বিবাহের ফলে পৃথিবী ফলবতী হবে, এই হল অনুষ্ঠানের পশ্চাদ্বর্তী বিশ্বাস। আদিম মানুষের অবৈজ্ঞানিক চেতনায় শস্য উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদন সমধর্মী। অধিকতর ফলন কামনা করে ব্যাভারিয়া ও অষ্ট্রিয়ার কৃষকরা বৃক্ষের প্রথম ফল সন্তানবতী নারীকে খেতে দেয়। ওরিনোকোর ইণ্ডিয়ান নারীরা ছেলে কোলে বীজ বপন করে। ছেলে কোলে নিয়ে নারীরা বীজ বপন করলে ফলন বৃদ্ধি পাবে, এ বিশ্বাস আজও সেখানে সক্রিয়। সাঁওতালদের মধ্যেও নারীকে দিয়ে প্রথম বীজ বপনের রেওয়াজ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। হোসঙ্গাবাদে অনুষ্ঠানিকভাবে হলকর্ষনের দিন জমিদারের ভগ্নী কিংবা কন্যারা কৃষকদের পিঠে খেতে দেয়। গোরখপুরে জমির বন্ধ্যাত্ব নিরসনের জন্যে মেয়েরা দলবদ্ধভাবে নগ্নগাত্রে রাতের অন্ধকারে হলকর্ষণ করে। উত্তরবঙ্গে ফসলের জন্য বৃষ্টির প্রার্থনা জানিয়ে নগ্ন কোচ ও রাজবংশী যুবতী হুতুমদেবের সামনে নৃত্য করে। এতৎসম্পর্কিত বহু বিবরণ ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটী প্রকাশিত Rain in Indian Life and Lore গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। কৃষির হাতবদল সত্ত্বেও কৃষি-অনুষ্ঠানের তদ্রূপ হস্তান্তর যে হয় নি, এ জাতীয় অনুষ্ঠান তার বিশ্বস্ত দলিল।

অন্যান্য লোকায়ত ব্রতানুষ্ঠানের ন্যায় পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠানও বোধ করি একদা এদেশে আর্য আগমনের বহু পূর্ববর্তী কালেও আবহমান মানুষের সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল। শিকার ও কৃষির উপর ছিল সে মানুষের সর্বৈব নির্ভরতা। যেখানে ঈশ্বর অনুপস্থিত, সেখানে ইন্দ্রজালে ছিল তার অনাহত আস্থা।

পৌষের শেষ সংক্রান্তির দিন সকালে কিংবা বিকেলে মেয়েরা ধনে-ভিরে-যবের শীষ, আলুর ফুল, দূর্বা ঘাস সংগ্রহ করে। পৌষের শেষ সূর্য অস্ত যায়। দিন রাত্রির সন্ধিক্ষণে মেয়েরা উঠোনে গোবরের গোলাকার 'এলুনি' বা

আলপনা দেয়। বকনা গরুর গোবর দিয়ে পৌষ বুড়ি তৈরি করে। পৌষ বুড়ি অর্থাৎ গোবরের চ্যাপ্টা গুলির উপর সংগৃহীত ধনে-জিরে-যবের শীষ, আলুর ফুল, দুর্বা ঘাস রোপণ করে। অনেকটা তোষলা ব্রতের মতো। তোষলা ব্রতেও গোবরের গুলি পাকিয়ে তাতে সবুজ দূর্বার ঘাস রোপণ করা হয়। আর তার উপর তুঁষ কুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বৃহত্তর কৃষিক্ষেত্রের শস্য সম্ভাবনা ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রে অনুকৃত। বিশ্বাস, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের সাফল্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এখানেও সেই একই সাদৃশ্যমূলক ইন্দ্রজাল প্রবণতা।

একই প্রক্রিয়ায় মানুষ যখন একাধিক হাতিয়ার নির্মাণে সমর্থ হল তখন থেকেই অনুরূপায়ণের (making alike) উপর অনিঃশেষ গুরুত্ব আরোপিত হল। উপ্ত হল ইন্দ্রজালের বীজ। নবলব্ধ বোধের ফলে প্রকৃতিকে বশীভূত করার ব্যাপারেও ইন্দ্রজাল-প্রয়াসের বিস্তার ঘটল।[৫]

কালক্রমে ইন্দ্রজাল ধর্মের অবয়বে রূপান্তর পেল।[৬] ধর্ম ইন্দ্রজালকে ধীরে ধীরে নির্জীব করতে শুরু করল। যেখানে ইন্দ্রজালের ব্যর্থতা, যেখানে শ্রেণীসমাজের দৃপ্ত আবির্ভাব, সেখান থেকেই ধর্মের সূত্রপাত। ইন্দ্রজালের দৃঢ়ভিৎ বিশ্বাস, প্রাকৃতিক নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। ধর্মের ধারণা, প্রাকৃতিক নিয়মের অধিদেবতাকে পরিতুষ্ট করে নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করে চলে।

ভ্রান্ত ভাবানুষঙ্গ থেকেই ইন্দ্রজাল শুরু হয়েছিল। সামাজিক শ্রেণীবিভাজন ও আনুষঙ্গিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্তিকে ভিত্তি করেই শ্রেণীগত শোষণের হাতিয়াররূপে ধর্ম বিশ্বাস ব্যাপ্তি লাভ করেছে।[৭] ইন্দ্রজাল এক আজগুবি সত্য।[৮] তদানীন্তন ইন্দ্রজালে আস্থাশীল মানুষের বিশ্বাস হল প্রথমটির যথাযথ ঘটনায় পরবর্তী সংঘটন অনিবার্য। সাদৃশ্যমূলক হোক আর সংযোগমূলক হোক, সমস্ত ইন্দ্রজালের মূলে এই একই চিন্তাধারা।

বৃষ্টির প্রয়োজন। অতএব বৃষ্টিপাতের অনুকরণ আবশ্যকৃত্য। সুতরাং জল ঢালা হল, জল ছিটিয়ে দেওয়া হল। ধারণা, বৃষ্টির অনুরূপায়ণের ফলে অর্থাৎ নকল বৃষ্টির প্রভাবে আসল বৃষ্টি অনিবার্য। এ বিশ্বাস থেকেই রাত্রির অন্ধকারে প্লোসকার উলঙ্গ মেয়ে-বৌ গ্রামপ্রান্তে জল ঢালে। হল্‌সহেরা দ্বীপের মানুষ গাছের ডাল জলে ডুবিয়ে বৃষ্টির অনুকরণ করে জল ছড়ায়। নিউ বৃটেনের লোক মুখে জল নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। এই একই ধারণার চিহ্ন উত্তর আমেরিকার 'নাটচেজ', পুণার 'বৃষ্টির রাজা',

ওঁরাওদের সরহুল, উত্তরবঙ্গের হুতুমপূজা, পূর্ববাংলার 'মেঘ্যারাণীর কুলা নামানো'র অনুষ্ঠানে অদ্যাবধি বিদ্যমান।

ইন্দ্রজালের ব্যর্থতা ধর্মকে জন্ম দিলেও ইন্দ্রজাল একেবারে বিলুপ্ত হল না। সমাজ থেকে রাতারাতি কোন বিশ্বাসের নিরঙ্কুশ অপসারণ ও বিলুপ্তি অসম্ভব। বিশেষত যে সমাজে উন্নত বিজ্ঞানবুদ্ধি অনায়ত্ত, সে সমাজে কোন বিশ্বাসের পশ্চাদপসরণ একান্ত মন্থর। ইন্দ্রজালের ব্যর্থতা আনুষ্ঠানিক ত্রুটি হিসাবে বিবেচিত হতো। ইদানীং বিজ্ঞান ব্যাপ্তি পাওয়া সত্ত্বেও ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যর্থতা আনুষ্ঠানিক ত্রুটি দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা সমাজে কম নয়। অনুকরণমূলক নৃত্যছন্দে ও সংগীত ঝংকারে মানুষের মনোবল বৃদ্ধি পায়। ফলে, কালের পার্থক্য সত্ত্বেও বাংলা দেশের লোকচর্যায় ইন্দ্রজালের স্মারকচিহ্ন দুষ্প্রাপ্য নয়। অবশ্য ইতিহাসের নিয়মে এ স্মারক-চিহ্ন বিদীর্ণ প্রাক্তনের ভগ্নাবশেষ মাত্র।[৯]

ইহমুখী লোকায়তিক ক্রিয়াকলাপ ও মতবাদের ব্যাপক বিস্তৃতি ও বিপুলবীর্য প্রতিরোধ একদা ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসেও ফাটল সৃষ্টি ধরেছিল। বাল্মীকির রামায়ণ তার সাক্ষী :—

কচ্চিন্ন লোকায়তিকান ব্রহ্মণান তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালা পণ্ডিত মানিনঃ॥
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেযু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্ত্যেতে॥[১০]

ইন্দ্রজাল ভিত্তিক লোকায়ত আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠানকে যখন নিঃশেষে গ্রাস করা গেল না তখন সামন্ত শাসিত সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্ম লোকচর্যার সঙ্গে একটা আপোষ রফা করার চেষ্টা করল। ব্যাসদেবকে বলতে হল :

দেশানুশিষ্টং কুলধর্মমগ্রং,
সগোত্রধর্মং ন হি সংত্যজেয্য।

ব্রাত্য, আর্য কিংবা অনার্য, যারা ব্রাহ্মণ-পুরোহিত কিংবা বর্ণভেদ মানতো না তাদের নারীসমাজে প্রচলিত অনুষ্ঠানকে 'যোষিৎব্যবহারসিদ্ধা,' বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলো স্মার্ত রঘুনন্দন। ব্রাত্যদের কৌলীন্যবিধানের জন্যে 'ব্রাত্য স্তোম' অনুষ্ঠানের প্রবর্তন সত্ত্বেও অবেদমার্গীমহলে বৈদিক ধর্মাচার দৃঢ়ভিৎ হয় নি। তৎসত্ত্বেও অসবর্ণ মিশ্রণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। ফলে কোথাও ইন্দ্রজাল ও ধর্ম একাত্ম হলো, আবার কোথাও ধর্ম ইন্দ্রজালকে

গ্রাস করল। জনবিরোধী শ্রেণীস্বার্থ ও তদানুষঙ্গিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্বার্থবুদ্ধি লোকচর্যাকে আচ্ছন্ন করেছে, বিকৃত করেছে। এক ব্রতের একাধিক পদ্ধতি ও প্রকরণ এবংবিধ সিদ্ধান্তের সমর্থক।

ব্রাহ্মণ্যধর্মী স্মার্তদের এহেন আক্রমণ আকস্মিক কিংবা অকারণ নয়। যে আক্রমণের ফলে প্রস্তুত বিকৃতির ধ্বস সুদূরপ্রসারী। কিন্তু তা সর্বত্র নয়। আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে বিবিধ শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত রূপান্তর সত্ত্বেও, সমাজ-সংক্রান্তির ধারানুসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনকে মেনে নিয়ে কিয়ৎ রূপান্তরিত হলেও বাংলা দেশের বিভিন্ন লোকচর্যা থেকে নানাবিধ আদিম লক্ষণ সমূলে নিশ্চিহ্ন হয় নি। রাঢ়ের পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠান তার অন্যতম নিদর্শন।

এখানেও আদিম ইন্দ্রজাল-মনস্তত্ত্ব সুস্পষ্ট। একটা গোলাকার ঢেঁকিনির উপর পৌষ বুড়ি স্থাপন করে তার চারদিকে আতপ চালের গুঁড়ো, আতপ চাল, ধান ইত্যাদি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পৌষ বুড়ির চতুর্দিকে খড়ের বেষ্টনী। আর তারই পাশে রাখা হয় একটি সিন্দুর-রঞ্জিত নোড়া।

যে সমাজের কামনা সন্তান ও শস্যে সীমিত তারই চিন্তাসত্রে আবির্ভূত বলে 'লিঙ্গ' ও 'লাঙ্গল' সমধাতুজ।[১১] 'সর্বতোভদ্রমণ্ডলে'র উপস্থাপনা বৈশিষ্ট্য তো নারী-জননাঙ্গের প্রতিরূপ। ভীলরা বীজ বোনার আগে ক্ষেতের মাটিতে অথবা পাথরে সিঁদুর দেয়, মনে করে মৃত্তিকা ঋতুমতী হলো। সদ্য কৃষি-শিক্ষিত মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি নিতান্ত নগণ্য ছিল বলে সন্তানের জন্ম ও ফসলের জন্ম সমসূত্র চিন্তায় একাকারত্ব পেয়েছিল, অদ্বৈতত্ব লাভ করেছিল ফসলের অধিষ্ঠাত্রী ও সন্তানের অধিদেবী। তাই উড়িষ্যার সন্তান-প্রার্থী জননীরা উদ্ভিদ-দেবী ব্রুন্দাবতীর কাছে আবেদন জানায়। ওরাওঁ মেয়েরা 'করম পূজা'র সময় করম ঝুড়িতে সন্তানের প্রতিনিধি শশা রাখে। মৈমনসিংহে সন্তানের মঙ্গল কামনায় ক্ষেত্তর ব্রত বা ক্ষেত্রব্রত করা হয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে জননীরা কুমার কার্তিকের ব্রত করে নবাঙ্কুর ধান্যশীর্ষে। উঠোনের মাঝখানে অনধিক এক ফুট ব্যাস পরিমিত গোলাকার মৃত্তিকাস্তূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, সেখানে ধান ছড়িয়ে দেয়। দিন পনেরো-ষোল পরে কার্তিক মাসের শেষ সংক্রান্তিতে সে ধানগাছে কুমার কার্তিকের পূজা হয়। পার্বতীপুত্র কার্তিকেয় এখানে ধান্যমূর্তিতে সংকেতিত। একদা এ ব্রতানুষ্ঠান নিঃসন্দেহে লোকায়ত ছিল। শস্য ও সন্তান এখানে সমসূত্রে সংবদ্ধ। উড়িষ্যার তুলা

সংক্রান্তির অন্যনাম গর্ভ-সংক্রান্তি। ঐ সময়ে ধান্যক্ষেত্র শস্যগর্ভা হয়। ওরাওঁ ভাষায় সরহুলের নামান্তর 'খেকেলবেঞ্জা' অর্থাৎ 'পৃথিবীর পরিণয়'। ফুলকর ব্রতের ব্রতকথাও এহেন বিশ্বাসের আর একটি নজীর। রাঢ়ের পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠানেও নোড়া লিঙ্গের প্রতীক এবং সিন্দুর ক্ষেত্রপ্রতীক পৌষ বুড়ির ঋতুমানতার নিদর্শন। মানবিক জননাঙ্গের সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা অবিচ্ছেদ্য।

ক্ষেত্রপ্রতীক পৌষ বুড়ি সিন্দুর আর রঞ্জিত নোড়ার উপর একটা বড় ঝুড়ি চাপা দেওয়া হয়। এ যেন সদ্য পরিণীত নবদম্পতির বাসরঘর।

এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে একটি বিষয় অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। ওরা পাঁচ থেকে নটা পৌষ বুড়ি তৈরি করে, এবং তৈরি করে বকনা গরুর গোবর দিয়ে। যে ক্ষেত্র শস্যবতী নয় অথচ শস্যবতী হওয়ার যাবতীয় উপযুক্ততা উপস্থিত, বয়স্কনী বা বকনা গরুর গোবর দিয়ে পৌষ বুড়ি তৈরি করার রেওয়াজে শস্যপ্রার্থী মানুষের ইন্দ্রজাল প্রবণতা স্পষ্ট। বকনা গরুর জনন ক্ষমতা ও গোবরের উর্বরা শক্তির মিশ্র প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এই প্রাচীন আচারে প্রতীকিত।

পৌষের শেষ সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হয়। পাড়ার মেয়েরা উঠোনে উঠোনে জমায়েত হয়। 'চাল কোটে। ঘরে ঘরে আশকে আর সরুচি পিঠে তৈরির ধুম। শুরু হয় পৌষ আগলানোর গান :

এসো পৌষ যেও না।
জন্ম জন্ম ছেড়ো না॥

পৌষকে ওরা বিদায় দিতে নারাজ। পৌষ তাদের জীবনে শস্যের সম্ভার নিয়ে আসে। অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ জীবনের মরুভূমিতে উৎসবের ঢেউ জাগে। হোক হৃতসর্বস্ব, সঙ্গতিহীন মানুষের সে উৎসব ক্ষণজীবী, তথাপি সে ক্ষীণ ক্ষণেই নীচু তলার অন্ধকারে জীবনের সঙ্গে আলোর শুভদৃষ্টি হয়। তাই পৌষকে ধরে রাখার জন্যে তাদের অপরিসীম আগ্রহ।

পোষ মাস লক্ষ্মী মাস না যাইও ছাড়িয়ে।
ছেলে পিলেকে ভাত দেব খান্দা ভরিয়ে॥
পোষ রে ভাই তোর দৌলতে সকরি পিঠে খাই!
হাতে কোলে ছেলে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাই॥

গানে গানে গৃহপ্রাঙ্গন মুখর হয়। ভাঙা কুঁড়ে উৎসবের আনন্দে উৎফুল্ল। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এত উদ্যোগ আয়োজন, এত আনন্দ, এত উল্লাস তার জন্যে বিদায়ের চতুর্দোলা দুয়ারে অপেক্ষমান, সে পৌষ যাই যাই করছে। ধরে রাখার প্রার্থনায় বজ্রের কানে তালা লাগলেও পৌষ শোনে না। অগত্যা তাকে যেতে দিতে হয়।

পৌষের রাত ভোর হয়ে আসে। যাবার জন্য সে ধীরে ধীরে পা বাড়ায়। ব্রতচারিণীরা বিনিদ্র। স্বরে পঞ্চমে গান্ধারে ধৈবতে একই প্রার্থনার আনাগোনা।

পোষের মাথায় চালের গুড়ি।
পোষ যায় রে গুড়ি গুড়ি ॥

পোষ পালালো পোষ পালালো ছোলা আড়ি দিয়ে।
ওই পোষকে ধরে আনবো শেঁয়া শাড়ী দিয়ে ॥
পোষ পালালো পোষ পালালো ক্ষুদের হাঁড়ি নিয়ে।
কাল পোষকে ধরে আনবো লাঙলা দড়া দিয়ে ॥

স্বল্পমূল্য শাড়ী আর ক্ষুদের সঙ্গেই গ্রামবাংলার বাগ্দী বাউরি মুচিবাযেনের একমাত্র পরিচিতি, আজ নয়, অনেক আগে থেকেই। ঋষি গৌতমের জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল : জীর্ণান্যুপানচ্ছত্রবাসঃ—কূর্চ্চান্যুচ্ছিষ্টাশনং। দেশে গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা ধান থাকলেও শূদ্রদের কপালে ক্ষুদকুড়োর বেশী জোটে নি। ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন, জীর্ণ পরিধেয়, অসার ধান্য আর ছেঁড়া মাদুর—এই ছিল শূদ্রদের মনু-নির্দিষ্ট জীবনমান।[১২] স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও যাদের জীবন মান প্রাগৈতিহাসিক স্তরে, পণ্ডিতম্মন্যারা যাদের মূঢ় জনতা (unthinking masses) আখ্যা দিয়েছেন, তাদের শূদ্রেতর নিবিত্ত জীবনে তবুও পৌষ আসে। একদিকে পৌষকে ধরে রাখবার অপ্রমেয় আকূলতা, অন্যদিকে পৌষের অনিবার্য প্রস্থান। প্রস্থানোদ্যত পৌষকে আকূল আবেদন জানিয়ে এরা গান করে।

ঘাটের পোষ মাঠের পোষ।
মেউ তলাতে জড়ো হোস ॥
আদাড়ের পোষ বাদাড়ের পোষ।
বড় ঘরের মেঝেয় জড়ো হোস ॥

মেহেদি কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা শস্যক্ষেত্রই তো পৌষের রাজসভা। সেইখানেই তার শস্য-সভাসদদের দল জমায়েত হয়।

পৌষের প্রস্থানলগ্ন সমুপস্থিত। গ্রামবাংলার বন্দরে তার বন্ধনকাল শেষ হল। কে জানে কোথায় কোন গৃহস্থের ঘর ভরে উঠবে পৌষের শুভাগমনে।

পোষের হাতে আড়ি কাঁকালে আড়ি।
পোষ যায় রে গেরস্থের বাড়ী॥
পোষ মাসের পোষের ঝারি।
বীনকাপাসে ঘর ভরি॥

মাঘের প্রথম সূর্য একটু পরেই দেখা দেবে। অনেক আগেই ঘরের দরজা থেকে পুকুরের ঘাট পর্যন্ত সারিবদ্ধ গোলাকার আলপনা রচিত হয়েছে। আলপনাগুলো এক একটি সরলরেখায় পরস্পর সংযুক্ত। একজন অনূঢ়া কন্যা এক হাঁড়ি পিঠে মাথায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বাড়ীর উঠোন পাড়ার ছেলে মেয়েতে জমজমাট। মেয়েটি পিঠের হাড়ি মাথায় বেরিয়ে এসে প্রথম আলপনার উপর দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দ্রুত একটা পাক খায়। হাঁড়ি থেকে কয়েকটি পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েরা কাড়াকাড়ি করে সে পিঠে কুড়িয়ে খায়। মেয়েটি সামনের এলুনিতে এগিয়ে যায়। আবার একপাক ঘোরে। ততক্ষণে তার পরিত্যক্ত এলুনিতে জনৈক যুবক এসে দাঁড়ায়। হাঁড়ি থেকে আবার পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। মেয়েদের মধ্যে আবার কাড়াকাড়ির হিড়িক পড়ে। মেয়েটি পরবর্তী এলুনিতে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্বর্তী ছেলেটাও আর এক এলুনি এগোয়। অন্য একজন যুবক শূন্য এলুনি পূর্ণ করে। এমনি করে অগ্রসর হতে হতে মেয়েটি শেষ এলুনিতে এসে দাঁড়ায়। শেষ এলুনিতে এসে সে আর পাক খায় না। সেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকে। পশ্চাদ্বর্তী যুবকের দল ক্রমান্বয়ে এক একজন করে এগিয়ে আসে। এগিয়ে এসে পিঠের হাঁড়ি থেকে পিঠে তুলে নিয়ে খায়।

লোকায়ত ব্রতানুষ্ঠান নিছক বন্ধ্যা ইন্দ্রজাল নয়। ধার্মিকতা বা অনুষ্ঠান কৈবল্যেই তা অবসিত হয় নি। মিশ্ররীতির শিল্প-স্বভাব আত্মস্থ করে তা এক বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। একদা শিল্প ছিল যাদু-হাতিয়ার। প্রকৃতিকে বশীভূত করার ব্যাপারে এবং সামাজিক সম্পর্কবর্ধনে সে হাতিয়ার ছিল মানুষের বিশ্বস্ত সহচর।[১৩]

ওরাওঁদের সরহুলের শেষে প্রতি বছর যেমন পাহান ও পাহানাইনের বিয়ে দেওয়া হয়, পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠানের শেষেও হয়তো একদা তদ্রূপ বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। দূরবর্তী প্রাক্তন ধারণা অনুসারে মানুষের যৌনজীবনের তৎপরতা ঐন্দ্রজালিক আচার-অনুষ্ঠান। পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ পৌষ বুড়ি বিসর্জনোত্তর গানগুলি অদ্যাবধি তার স্মারকচিহ্ন।

পৌষকে ধরে রাখা গেল না। মাঘের প্রথম প্রহরে পৌষ বুড়ি বিসর্জন দিয়ে ওরা দল বেঁধে স্নান করে। মাঘ-স্নান। ওরা বলে 'মাঘ-স্যান'। স্নান সমাপন করে পুকুরের পাড়ে তারা আগুন জ্বালে।

আগুনের সঙ্গে কৃষিনির্ভর মানুষের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্মরণাতীত কালের। সমস্ত য়ুরোপখণ্ডের কৃষকরা বৎসরের বিশেষ সময়ে অগ্নি-উৎসব উদ্‌যাপন করে, প্রজ্বলন্ত অগ্নি প্রদক্ষিণ করে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানীর বিভিন্ন অংশে এহেন বহ্ন্যুৎসবের প্রচলন আছে। তারাও নৃত্যে গানে প্রার্থনা জানায়। গ্র্যাণ্ড হল্‌ক্স্‌-এ কাঠ খড় দিয়ে তৈরী পেত্নী (makral) দাহ করা হয়। ফ্রান্সের কোন কোন অঞ্চলে 'গ্র্যানাস-মিআস্' (Grannas-mias) নামক বহ্নি-উৎসবে খড়ে তৈরি মশাল (granno-mio) জ্বালানো হয়। এবং সে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে বিভিন্ন গাছের নীচ দিয়ে যেতে যেতে তারা গান গায়:

মশাল জ্বলে।
প্রতি শাখা ভর্তি ঝুড়ি ঝুড়ি ফলে।[১৭]

শস্যের সমৃদ্ধি কামনায় অস্ট্রিয়া, সুইৎজারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, গ্রীসের চাষীরা বহ্নি-উৎসব করে। চট্টগ্রামে 'ভেড়ার ঘর' পোড়ানোর অনুষ্ঠানও এহেন দূরগত একান্ত কৃষিনির্ভর সমাজে ফসলপ্রার্থী মানুষের বহ্নি-উৎসব। শস্য ও সন্তানের শুভ বিধান আদিম অগ্নিসম্পর্কিত সংস্কারের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই শস্য ও সন্তানকে বিপদ-মুক্ত করার জন্যে এবংবিধ বহ্নি-উৎসবের ব্যাপক আয়োজন।[১৫]

পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠানেও মেয়েরা ও ছেলেরা আগুনের দুদিকে দল বেঁধে দাঁড়ায়। একদিকে ছেলেরা, অন্যদিকে মেয়েরা। শুরু হয় গানে গানে চাপান কাটান

ছেলেরা। পাথুরিতে টেঙ্গা দৈ
ভাইভাতারিদের ভাতার কৈ ?
মেয়েরা। পাথুরিতে টেঙ্গা দৈ,
বোনমেগোদে মাগ কৈ ?

ছেলেরা। উলোর বনে চেলালো,
ভাইভাতারিদের খেলা লো ॥
মেয়েরা। তাঁতখোলাখানা তাতলো।
বোনমেগোরা মাতলো ॥

মেয়েরা হাসিতে হুল্লোড়ে ঢলে পড়ে পরস্পরের গায়ে। ছেলেরা খানিকটা খাবি খায়। মেয়েরা আবার গান ধরে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি আর উদ্বেল নৃত্যতৎপরতা। যৌবনের ঢল কুলের বন্ধন লঙ্ঘনে উদ্যত। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা সামনের দিকে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নাচে। উদ্বেল, উদ্দাম, অপ্রতিহত স্বরের শরসন্ধান।

মেয়েরা। কুলোর ডগে নুন।
বোনমেগোদের গুণ ॥
কুলোর ডগে জিরে।
বোনমেগোদের কিরে ॥
ছেলেরা। ভাই খা ভাতার খা।
এগিয়ে আয় আরেক পা ॥
আর এক পা আয় লো।
ভাইয়ের মাথা খা লো ॥

এহেন চাপানে কাটানে বেলা বাড়ে। মাঘের সূর্য পৃথিবীর দিকে স্থির নিবদ্ধ-দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত সন্ধি হয়। ছেলেমেয়েদের মিলিত ঐকতানেই পৌষ আগলানোর পরিসমাপ্তি। যুবকযুবতীদের মিলিতকণ্ঠে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সংগীত সন্তান ও শস্যের দ্বৈতচিন্তাকে অদ্বৈত সন্ধিতে সমন্বিত করে।

কেঁউটি কুটি মেউটি
দুয়োরে বসো সে।
ছোট ছোট পিঠেগুলো
গালে ভরো সে।
হুকি হুয়া কাঠালের কোয়া।
ছেলেপিলেকে বাগিয়ে শোয়া।

পৌষ আগলানোর এই সমবেত সংগীত নিঃসন্দেহে কামকেলির বার্তাবহ।

পৌষ আগলানো অনুষ্ঠানের এ পর্যায় কোন কোন স্থানে স্বতন্ত্র। একই গ্রামের ছেলে-মেয়েরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এভাবে গান করার পরিবর্তে দল

বেঁধে লাঠি-সোঁটা নিয়ে কোন মাঠে এসে উপস্থিত হয়। ভিন গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরাও লাঠি সোঁটা নিয়ে সে মাঠে হাজির হয়। যারা আগে আসে তারা মাঠের মাঝখানে একটি লাঠি পুঁতে রাখে। অন্যদল এসে সে লাঠির পাশে তাদের লাঠি পুঁতে। প্রথম দল পরবর্তী দলের লাঠি তুলে নেবার জন্যে হুংকৃত আদেশ জারী করে। একই আদেশ ঘোষিত হয় ভিনদলের কম্বুকণ্ঠে। একদিকে ছেলেরা, অন্যদিকে মেয়েরা সদলে এগিয়ে আসে। এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর সেই ছড়া কাটাকাটি। গানে গানে চাপান কাটান চলে। উত্তর-প্রত্যুত্তর। মারামারি। শেষে মারামারি রক্তারক্তিতে পরিণত হয়। পৌষ আগলানো উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই 'পিঠে লড়াই'য়ে হারজিৎ অনিবার্য। এই লড়াই হয়তো আদিমযুগের ক্ষেত্রকেন্দ্রিক সংঘর্ষের ভগ্নাবশিষ্ট স্মৃতিকথার জীর্ণ পদাবলী। অদৃশ্য শক্তির নিকট জমির জন্য ভিক্ষুকের মত যুক্তকর যাজ্ঞা নয়, উদ্দাম আত্মবিশ্বাসে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার যৌথ প্রয়াস—এই লোকায়ত প্রবণতার স্মারক হিসাবে পৌষ আগলানোর এ বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

পৌষ আগলানো সগোত্র লোকায়ত উৎসব অনুষ্ঠানগুলি হয়তো একদা গণগোত্র বিবাহ বিধানের প্রসারকে সহায়তা করেছে।

পৌষ অগেলানোর অনুষ্ঠান শেষ হয়। ব্রতচারিণীর দল আকাশে তাকায়। আকাশে চিল, আমগাছে মুকুল। শঙ্খ চিল আর আম্রমুকুলের দিকে তাকিয়ে তারা বলে :

শঙ্খচিলের ঘটিবাটি।
গোদা চিলের মুখে লাথি ॥

পৌষ আগলানো অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচারের ক্ষীণতম চেষ্টা অভাবিত। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের নিঃশ্বাসে বাঙ্গালীর লোকায়ত অনুষ্ঠান অদ্যাপি নিশ্চিহ্ন হয় নি। 'ব্রাহ্মণাদর' কিংবা 'গুপ্তধন ব্রতে'র মতো পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের লোভাতুর অভিসন্ধি সম্যক সিদ্ধার্থ নয়।

রাঢ়ের পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠান লোকায়ত। তাই তিথি নয়, ঋতুর প্রতিই তার আনুগত্য। আলপনায়-ছড়ায়, নৃত্যে-গীতে একটি সামাজিক যৌথ কামনাই এ অনুষ্ঠানে সবাক। প্রাকৃত জনের ভাষা দিয়ে রচিত ছড়াই এ লোকায়ত ব্রতানুষ্ঠানের মন্ত্র। আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন,

পঞ্চগব্য শোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যার্ঘ, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, বিশেষার্ঘ্য —এখানে কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এ লোকায়ত অনুষ্ঠানের পশ্চাদ্বর্তী কামনা ব্যক্তিক নয়, সর্বৈব সামাজিক। উপকরণ আহরণ থেকে অনুষ্ঠানিক আচরণ পর্যন্ত সর্বত্রই পুরাণ সংহিতা-নিরপেক্ষ মানবিক ইহ-প্রবণতার প্রাবল্য। রাঢ়ের পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠান ইন্দ্রজাল-মনস্কতা ও শিল্পপ্রবণতার মিশ্রনফল। এই মিশ্র বৈভবে ভাস্বর অনুষ্ঠান প্রাক্তন সমাজের চিত্রালেখ্য। এ অনুষ্ঠানের দর্পণে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত করলে আমদের বিস্মৃত অতীত ও অপসৃত সমাজ-ইতিহাস উন্মোচনের অবকাশ ঘটে। কিন্তু রাঢ়ের এই নীচের মহলে অবর্ণনীয় দুঃস্থতা যে তড়িৎ গতিতে ভীষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে তার ফলে এবং নতুন সম্পদ-সম্পর্ক ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াবশত এবংবিধ বিস্মৃতপ্রায় অতীত ও বর্তমানের মধ্যবর্তী যাবতীয় লোকায়ত অনুষ্ঠান সঙ্গতকারণেই অতি দ্রুত তিরোহিত হচ্ছে। বাঙ্গালীর বিজ্ঞানসম্মত সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তার অনতিবিলম্ব সংগ্রহ লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধিৎসু কর্মীর আশুকৃত্য। শুধু সংগ্রহ নয়, এ সব লোকায়ত অনুষ্ঠানের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও একান্ত প্রয়োজন, বিশেষত আমাদের দেশে। বাস্তবজীবনের প্রেক্ষাপটে ধর্মানুষ্ঠানের বিচাব বিশ্লেষণ, বাস্তব উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে তার সংযোগ নির্দেশনার জন্য দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। বাস্তববিমুখ ভাববাদের দ্বারা কোন বিষযেরই, এমন কি ধর্মেরও যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।[১৬] কারণ, ধর্মের সমালোচনা প্রকৃতপক্ষে সমাজব্যবস্থারই সমালোচনা।

পাদটীকা

১. At the same time division of labour develops, being originally nothing else than the division of labour which took place of itself or "naturally" as a result of natural aptitude (e.g. bodily strength), needs, coincidence, etc. etc. The division of labour becomes real division only from the instant when the division of material and spiritual labour take place.

—Karl Marx & Frederich Engels :
On Religion (Moscow 1957) p. 76.

২. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartles world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people.

—Karl Marx & Fredirich Engles : On Religion (Moscow, 1957), p. 42.

৩. ...in the world of magic, it seems as if man's self-feeling was an active creative force, and that the emotions he felt stir within him were flooding the world of reality. They seems to possess *him* (for he has not yet found himself) and nature (for he is in active relation with nature), and to be source of movement and power, moulding the world of phenomena to their shape. The world therefore becomes interpreted in terms of these effects. but since affects can not be bodied forth socially and interpretation is a social action, these affects become interpreted in terms of the stock of ideas socially available, drawn from the social activity of the community, and in terms of the actions and behaviour of men in society. This very interpretation changes them, and we have therefore a mythology in which ordinary terms, the description of ordinary activities, and ordinary men, women, and animals become large, sacred, rigid, hieratic, awesome and hybrid. We have series of actions which become formalised, stereotyped, emotional and abstract—the ritual 'dances, ceremonies and initiations. This body of magic ideas and behaviour acts and reacts upon profane ideas and behaviour but in a primitive community never becomes isolated from them. Most activities and ideas have a magical element; most magical activities have a social function.

Now because such a magic is the by-product of the social relations engendered by economic production, it advances and develops equally with production at the primitive level of society.

Christopher Caudwell : Further Studies in a Dying Culture. p. 28

৪. R. Briffault : The Mother
W. W. Hunter : The Imperial Gazetteer of India, 1881
George Thomson : An Essay on Religion

৫. The exciting discovery that natural objects could be turned into tools capable of influencing and altering the outside world was bound to lead to another idea in the mind of early man, always experimenting and slowly awakening to thought : the idea that the impossible, too could be achieved with magic tools—that nature could be 'bewitched' without the effort of work. Overwhelmed by the immense importance of similarity and imitation, he deduced that, since all similar things were identical, his power over nature—by virtue of 'making alike'—could be limitless. The newly acquired power to grasp and control, to prompt social activity and bring about events by means of signs, images, and words, led him to expect the magical power of language to be infinite.

Fascinated by the power of the will—which anticipates and brings about things that are not yet there but exist only as an idea in the brain—he was bound to ascribe an immensely for reaching, boundless power to acts of will. The magic of tool-making led inevitality to the attempt to extend magic to infinity.

—Ernst Fischer : The Necessity of Art. pp. 33-34.

৬. Even while the development of seience and art reveals more truely the precise relation between man and nature, between man's self-feeling and nature's necessity, a relation which magic only imperfectly expressed, the division of labour in economic production had provided a development in magic. The two developments overlapped. Magic disappeared, became outcast and suspect, became increasingly replaced by science and art, and at the same time magic re-appeared in a new and more powerful form. It became religion.

Christopher Caudwell : Further Studies in a Dying Culture p. 31.

৭. Religion arose in every primitive times from erroreous, primitive coceptions of men about their own nature and external nature surrounding them.

Even history of religlon even that fails to take account of this material basis, is uncritical. It is, in reality, much easier to discover by analysis the earthly core of the misty creation of religion, than conversely, it is, to develop from the actual relations of life the corresponding celestialized forms of those relations. The latter method is the only materialistic, and therefore the only scientific one.

—Karl Marx & Frederich Engels : On Religion (Moscow, 1957), p. 136.

৮. Though magic is a reality, it is a *fantastic* reality. Affects and outer reality are blended, and confusingly blended. One distorts the other; man has not yet learnd to distinguish them in science and art. Yet the interpenetration which begets their distortion also ensures at this stage their mutual correction Magic does not replace economic production : it is a speacial offshoot of it, and therefore is a distorted reflection of it. But it is a conscious cultural reflection, portable, easily inherited and easily modified. These conveniences outweigh the distortions. Because magic, by reason of its association with economic production, contains in its mythology and ritual the correct opperations for sowing and reaping or hunting, crystallises the family and tribal social relations, is compndious calendar and tribal guide, and can be handed on and shared socially, it is an invaluable ally to economic production. It is a special social conseiousness of economic production of the functioning of the tribe in relation to nature.

Christopher Caudwell, Further Studies in a Dying Culture, pp. 30-31

৯. In proportion as economic production develops and becomes a division of labour, magic splits up and soon ceases to reflect man's direct relation to nature. It ceases to be an almanac and storehouse of the more abstract and generalised economic experiences. It becomes on the one hand art, in which all its affective organisation crystallises and on the other and science, in which all its cognitive organisation is marshalled. Thus with the development of art and science magic as an important vital element in economic production disappears, because the very development of economic prouction which it has helped to bring about has made it unnecessary. Man has found himself. He has seperated himself from the enviornment again, in art and science, not absolutely but as part of a new and more active interpretation. Magic now only survives, not as the proud flower of social life, mother of all social power and status, but as somthing lingering on in interstices and crevices.

Chiristopher Caudwell : Further Studies in a Dying Culture. p. 31.

১০। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০.২৮-৩৯।

১১। লিঙ্গ ∠ লিন্‌গ (গমন করা)+অ
লাঙ্গল ∠ লন্‌গ { গমন করা)=অল (ত্তৃ)

১২। উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ॥

১৩. Art was a magic tool, and it served man in mastering nature and developing social relationships........ Rhythmical movement assist work, coordinates effort, and connects the individual with a social group. Every disturbance of the rhythm is disagreeable because it interferes with the processes of life and work ; and so we find rhythm assimilated in the arts as the repetition of a constant, as proportion and symmetry. And, lastly, an essential element of the arts is the fearsome, the awe-insprine, and that which is supposed to confer power over an enemy. Clearly the decisive function of art was to exert power—power over nature, an enemy, a sexual partner, power over reality, power to strengthen the human collective.

—Ernest Fischer : The Necessity of Art, pp 35-36,

১৪. Brando, brandounci tsaque brantsa, in plan panei.

১৫. .. the fire is belived to promote the growth of the crops and the welfare of man and beast, either positively by stimulating them. or negatively by averting the dangers and calamities which threaten them from such causes as thunder and lightning, conflagration, blight, mildew, vermin, sterility, disease and not least of all witchcraft.

—Sir J. G. Frazer : The Golden Bough. P. 624.

১৬. The men who has found in the fantastic reality of heaven, where he sought a supernatural being, no more than his own reflection, will no longer be satisfied to find only the semblance of himself, only the unhumen, where he seeks, and must seek, his true reality.

The basis of irreligious criticism is: Man makes religion, religion does not make man. And, in truth, religion is conciousness of self and the self-feling of a man who has not got found himself or has lost himself again. Also man is not an abstruct being existing outside the world. Man—that is, the world of men, the State, society. This State, this society, produces religion—an inverted consciousness of the world—because the world itself is an inverted world. Of *this* world religion is the general theory, its encyclopædic compendium, its logic in popular thought, it spiritual *point d'honneur*, its enthusiasm, its moral sanction, its solemn completion, its universal ground for truth and justification. It is the imaginary realisation of the human essence, necessary because the human essence has no true reality. The struggle against religion is therefore, indirectly, the struggle against the world whose spiritual aroma is religion.

Religions misery is at once the expression of real misery and a protest against that real misery. Religion is the sigh of the hard-pressed creature, the heart of a heartles world, the spirit of unspiritual conditions. It is the opium of the people.

The removal of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness. The demand that they should give up illusions about their real conditions is the demand that they should give up the conditions which make illusion necessary. Criticism of religion is therefore at heart a criticism of the vale of misery for which religion is the promised vision.

Criticism has torn away the imaginery flowers with which his chain were decked, not in order that man should wear his chain without the comfort of illusions, but that he may throw off the chains and pluck the living floewrs. Criticism of religion disillusions man so that he may think, act and shape his reality as one who is disillusioned and come to full understanding, so that he may move on his own axis and thus be his own sun. Religion is but the false sun which revolves around him while he is not yet fully aware.

Thus it is the *function of history*, after the *otherworld truth* has collapsed, to establish *this world's truth*. Then, it is the *function of philosophy*, in the service of history, having destroyed the supernatural semblance of man's self-alienation, to go on and destroy the secular form of this self-aliention. Crticism of heaven thus turns into criticism of the world, *criticism of religion* into *criticism of Law*, and *criticism of theology* into *criticism of politics.*

Philosophy of Law : Introduction to a Critique of Hegel's
Karl Marx, p 44

লোকচিত্রকলা

পট নামের উৎস

পট প্রাসঙ্গিক আলোচনায় পণ্ডিতমহল অন্তত একটি সিদ্ধান্তে একমত। সিদ্ধান্তটি পটের নাম সংক্রান্ত। তাঁদের অভিমত, সংস্কৃত 'পট' শব্দ থেকেই বাংলা 'পট' শব্দের উদ্ভব। সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তনের মাধ্যমে কালক্রমে বাংলা পটে পরিণত হয়েছে।[১]

এবংবিধ অনুমানের স্বপক্ষে প্রচলিত যুক্তি হল, প্রাথমিক পর্বে আলোচ্য চিত্রকলা বস্ত্রখণ্ডের উপর অঙ্কিত হত। বস্ত্র বা পট্টের উপর অঙ্কিত হত বলেই তার নাম হল পট। এ যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত সমর্থন করলে যে বক্তব্য অবশ্যম্ভাবী তা হল, পট যে ভারতবর্ষে কেবল আর্য আগমনের পরবর্তী তাই নয়, বয়সে সংস্কৃত ভাষারও কনিষ্ঠ।

অধুনা হস্তগত কিয়ৎ অভিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, পট যে শুধু সংস্কৃত ভাষার বয়োজ্যেষ্ঠ তা নয়, আর্য আগমনেরও পূর্ববর্তী। অতএব সংস্কৃত 'পট্ট' থেকে 'পট' শব্দের উদ্ভব সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত তর্কসাপেক্ষ হয়ে পড়ে। বিসংবাদের হেতু, আর্যপূর্ব কালে পট অর্থে প্রচলিত শব্দ ও সে শব্দের সঙ্গে পট শব্দের ঘনিষ্টতা। পট প্রসঙ্গে উপস্থাপিত বিসংবাদে উত্তরপক্ষের প্রমাণপুঞ্জ মূলত দু'ভাগে বিভক্ত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলোকেও দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক।

আর্যেরা ছিলেন নিরাকারবাদী। নিরাকারবাদ শিল্প-স্থাপত্যের পোষকতা করে না। আর্য-প্রাধান্যের কবল থেকে প্রাক-বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সময়ের সীমায় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের সর্বৈব অনুপস্থিতি এহেন সিদ্ধান্তের সমর্থক।

আর্যীকরণ ও আর্যপ্রাধান্য প্রসঙ্গে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে অহেতুক গুরুত্ব দিয়ে সংস্কৃত 'পট্ট'ই বাংলা পটের প্রসূতি বলে এই লোকচিত্রকলার নামরূপকে সংস্কৃত পরবর্তী যুগে সীমায়িত করে রাখার প্রয়াস অসঙ্গত। এ চিত্রকলা যে

আর্যপূর্ব ভারতীয়দের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল তার প্রমাণ ভারতীয় সাহিত্যে বিরল নয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে এবংবিধ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কতিপয় উদাহরণ উপস্থাপিত করেছেন।

সিংহলের স্বনামধন্য ভাস্কর ও স্থাপতি বিদ্যুৎজিহ্ব ছিলেন রাক্ষস। যে ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞাগার নির্মাণ করেছিলেন তিনি ছিলেন অনার্যকুলোদ্ভব। মৌর্যযুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর তুসাস্ফও তাই। রাজতরঙ্গিণী রচনাকার কহ্লন (খ্রী. ১২শ শতক) চণ্ডালবংশীয় সূর্যের শিল্প-স্থাপত্যের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল যে সব শিল্পীর নামোল্লেখ করেছেন তাঁরা সকলেই অনার্য ও তথাকথিত নীচকুলোদ্ভব। স্বনামধন্য শিল্পী দম্বন্ত ও কেশু ছিলেন কাহার! শিল্পের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা স্বভাবত তৎকালে অধিকতর ছিল। অতএব, পটের ক্ষেত্রে আযপূর্ব ভারতীয়দের শিল্পপ্রয়াসের প্রতিই এসব উদাহরণের অনিবার্য আঙ্গুলি-সংকেত।

একদা ব্রাহ্মণ কুলপতিগণ চিত্রকরদের সমাজচ্যুত করেছিল। হেতু, ব্রাহ্মণ্য নির্দেশনামা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা মেনে নেয় নি।[২] এ বিসংবাদের মূল অনুসন্ধান করতে গেলে অবশেষে সাকার ও নিরাকারবাদীদের বিবাদ-বিতর্কে এসে হাজির হতে হয়। অন্যান্য বহিরাক্রমণকারীদের মত আর্যরাও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে আপন সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েম করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসী হয়েছিল। বারংবার ব্যর্থতা বরণ করেও তারা হাল ছাড়ে নি।

দৃশ্যমান ইহজগৎ ও আদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে যখন বিরোধ কল্পিত হয় তখন রূপময় শিল্পের সৃষ্টি অসম্ভব। ইহজগৎ যখন সর্বৈব মিথ্যা মায়া তখন সে দর্শন শিল্পের পোষকতা করে না। তাই বেদে 'চিত্র' শব্দটিরও একেবারে উল্লেখ নেই। তৎসত্ত্বেও 'পট' শব্দটিকে আর্য-উৎসে সংযুক্ত করা সঙ্গত কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্নের আবির্ভাব অনিবার্য।

পটুয়াদের আত্মপরিচয়, তাঁরা বিশ্বকর্মার সন্তান। বিশ্বকর্মা বিশিষ্ট শিল্পী ও স্থপতিরূপেই পরিজ্ঞাত। দেবতাদের পংক্তিতে পাংক্তেয় হলেও তিনি যেন দেবকুলের বেতনভুক কর্মচারী। আর্য দেব-মহলে তাঁর আভিজাত্য অত্যন্ত ক্ষীণ। নিম্নশ্রেণীর শিল্পীরা ছাড়া আজও তেমন কোন অভিজাত তাঁর পুজা করে না। কার্যোপলক্ষে দেবতারা বিশ্বকর্মাকে তলব করতেন। আর্যকুলের সঙ্গে

বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠতা ছিল, শুধুমাত্র এই যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বকর্মার আর্যত্ব তর্কাতীতভাবে প্রতিপন্ন হয় না। বিস্তর দৃষ্টান্তে এ কথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে বৈদিকযুগের যাবতীয় সংঘর্ষে দুই বিবদমান দলেই আর্য ও অনার্য সমবেতভাবেই দলবদ্ধ হয়েছিল। একদিকে ইন্দ্র যেমন দাসরাজ সম্বরের শত নগর ধ্বংস করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি অনার্যরাজ ত্রসের সঙ্গে মিত্রতাও স্থাপন করেছিলেন। আর্য অর্ণ ও চিত্ররথ ছিলেন যজ্ঞবিরোধী। যজ্ঞবাদী আর্যদের হাতেই তাঁদের মৃত্যু হয়। বিশ্বকর্মা অনার্য হলেও যজ্ঞবাদী ইন্দ্রের দলভুক্ত হতে বিন্দুমাত্র বাধা নেই। আর তাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে তাঁর আভিজাত্য ও প্রতিপত্তি ক্ষীণ হওয়াই স্বাভাবিক। আভিজাত্য ও প্রতিপত্তির এই ক্ষীণতাবশতই হয়তো কোন আর্যকন্যার পাণিগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি, অনার্যকন্যা ঘৃতাচীকে পত্নীত্বে বরণ করেই তিনি কৃতার্থ হয়েছিলেন। শূদ্রাণী ঘৃতাচীর গর্ভে তার ন'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। চিত্রকর তাদের অন্যতম।[৩] ব্রাহ্মণরাই তাদের অভিশাপ দিয়েছিল।[৪] রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রও তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থে বিশ্বকর্মার প্রতি বেদব্যাসের অভিশাপের কথা উল্লেখ করেছেন।[৫] এবংবিধ কাহিনী ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পকে আযপূর্বযুগের অনায সৃষ্টিরূপে প্রতিপন্ন করে। আর্যরা কোন শিল্পচেতনা নিয়ে এদেশে আসে নি। পরবর্তীকালে হয়তো তারা অনার্যদের প্রভাববৃত্তে এসে এই শিল্পচেতনাকে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মসাৎ করেছিল।

অদ্যাবধি আমাদের সমাজে পটুয়া বা চিত্রকর সম্প্রদায় অচ্ছ্যুৎ। একটি বিচিত্র জীবন তারা যাপন করে। বর্ণহিন্দুদের কাছে তারা ঘৃণ্য ও সমাজ-বহির্ভূত। মুসলমানযুগে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তারা অসম্মানের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজেছিল। বৌদ্ধযুগেও একবার এহেন ঘটনা ঘটেছিল। বৌদ্ধপ্রাধান্যের যুগে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেও তারা অভিজাত হতে পারে নি। বৌদ্ধরা স্বধর্ম প্রচারে পটকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছিল, কিন্তু পটুয়ারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রইল।

অনেকে পটুয়াদের বৌদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।[৬] আসলে তারা আর্য আগমনের পূর্ববর্তী দ্রাবিড ভাষাভাষী গোষ্ঠীরই উত্তরপুরুষ। আধ্যাত্মিক ধর্মজীবনের প্রতি তাদের আসক্তি আন্তরিক নয়। তাই বিভিন্ন যুগে সবচেয়ে বেশী প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ধর্মমতের অন্তর্গত হতে তাদের বিন্দুমাত্র আটকায় নি। এখনও অনেক পটুয়া পুরুষ মসজিদে যায়, নামাজ পড়ে। তাদেরই ঘরের

মেয়েরা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ব্রত-আচার পালন করে। মুসলমান হলেও তারা হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকে, তাদের মহাত্ম্য কীর্তন করে।

প্রসঙ্গত একথা স্মর্তব্য, মহাভারত তাদের শিল্পীমনে কোন রেখাপাত করে নি। পটে মহাভারতের চিহ্ন বিরল। নানাবিধ লোককাহিনী, লৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখের কথা তাঁদের চিত্রে প্রমূর্ততা পেয়েছে। বৈদিক দেব-দেবীর একান্ত অনুপস্থিতি এবং ইহজাগতিকতামুখী মনোবৃত্তি প্রমাণ করে পট অনার্যবংশোদ্ভব।

যে সব ভারতীয় সাহিত্যে পটের উল্লেখ ও বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্তব্য তন্মধ্যে বিদগ্ধমাধব (খ্রী. ১৬শ শতক), উত্তররামচরিত (খ্রী. ৭ম/৮ম শতক), হর্ষচরিত (খ্রী. ৭ম শতক) মুদ্রারাক্ষস (খ্রী. ৫ম শতক), অভিজ্ঞান শকুন্তলম ও মালবিকাগ্নিমিত্র (খ্রী. ৪র্থ শতক), এবং হরিবংশ (খ্রী. ২য় শতক) উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধসাহিত্যের মধ্যে সারত্থপকাসিনী (খ্রী. ৫ম শতক)[৭], সংযুত্তনিকায় : খন্দসংযুত্ত (খ্রী. পু. ৬ষ্ঠ শতক)[৮] ও জাতকগ্রন্থের মধ্যে পটের বিশদ উল্লেখ বিদ্যমান। মস্করীবৃত্তিই ছিল মক্খালীপুত্ত গোসালীর পিতার জীবিকার্জনের উপায় (আনুমানিক খ্রী. পূ. ৭ম শতক)। অতএব এ যাবৎ প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক সাহিত্য-নিদর্শন পটকে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে উপস্থাপিত করে।

একদা পূর্ববঙ্গে গাজীর পটের ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রসঙ্গত একথাও অবশ্য স্মর্তব্য যে পূর্ববাংলায় প্রচলিত গীতিকার অন্য নাম গাজীর গীত। সুদূর অতীতে চারপাশের জগৎ ও জীবনে কাহিনীগুলি হয়তো চিত্র সহযোগে গীত হত। এ জাতীয় গীতিকার উৎস-কাহিনী কখনও কখনও খ্রীষ্টপূর্ব বহু দূরবর্তী অতীতে প্রচলিত কাহিনীরই পরিমার্জিত ও বিবর্তিত রূপ। তা ছাড়া 'ফিরোজ খাঁ,' 'মুকুট রায়' প্রভৃতি পূর্ববঙ্গ গীতিকায় পটের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হয়েছে।

আলোচ্য সাহিত্য-নিদর্শনে পট কখনও দীঘল, কখনও বা চৌকো। মনুষ্যমূর্তির চিত্রণ ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজবিধানে একদা নিষিদ্ধ ছিল।[৯] যদি মানুষের মূর্তি সুন্দর আর সুগঠিতও হয়, তথাপি তাকে পরিত্যাগ করে কুরূপ দেবমূর্তিকে শিল্পের ক্ষেত্রে স্বীকার করতে হত। এ স্বৈরাচারকে

স্বীকার না করেই লোকশিল্পীর মর্মান্তিক নিগ্রহ। উৎপীড়নের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও তারা সর্বাত্মক বশ্যতা স্বীকার করে নি।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পটকে অধিকতর প্রাচীন উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত করে। মহেঞ্জোদরো, হরাপ্পা, সিঙ্গানপুর, অজন্তা, খাজুরাহো, পাহাড়পুর, অমরাবতীর চিত্ররীতির সঙ্গে পট-অঙ্কনরীতির ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য প্রমাণ করে, আলোচ্য লোকচিত্রকলা আর্য-পূর্ববর্তীকালে শৈল্পিক অপোগণ্ডত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। ভারতের লোকজীবনে তার ধারাবাহিকতা অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত।

পটের উৎস নির্ণয় ব্যাপারে মহেঞ্জোদরোর কতিপয় প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। ডঃ হাইনশ মোদে এই নিদর্শন-গুলির মধ্যে ভারতীয় লোককথার উৎস আবিষ্কার করেছেন। এই উপকরণগুলো ভারতীয় লোককথার উৎস তো বটেই, অধিকন্তু পটেরও উৎসরূপে প্রতীয়মান।

সামগ্রিকভাবে দীঘলপট মিশ্রশিল্প। কাহিনী ও চিত্রের সমবায়ে দীঘল পটের সম্পূর্ণতা। এ মিশ্ররীতি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ভারতবর্ষে অনুসৃত। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাধ্যমে সে সত্য বিশ্লেষণের জন্যে ব্যাঘ্রজাতক প্রসঙ্গে একটি বক্তব্যের উপস্থাপনা প্রাসঙ্গিক। ব্যাঘ্র-জাতকের কাহিনীতে যদিও ব্যাঘ্র ও সিংহের উল্লেখ আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্বের উপদেশ শিরোধার্য করে অপরাধী দেবতা যখন ঐ অরণ্য থেকে প্রস্থিত পশুদের ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রার্থনা করেছিল তখন শুধুমাত্র ব্যাঘ্রেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[১০] সুতরাং মনে হয়, বোধিসত্ত্ব ও রাজতন্ত্রের প্রতীক সিংহ জাতক-সঙ্কলন কালীন বৌদ্ধপ্রাধান্য ও প্রয়োজন বশত বুদ্ধপূর্ববর্তীকালে প্রচলিত এ লোক-কাহিনীতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

মহেঞ্জোদরো এবং সামুদবোতে প্রাপ্ত সীলসমূহ এ আলোচনায় গৃহীত হল। ধারণাকে সহজসাধ্য করার জন্যে সীলগুলির রেখাচিত্র গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রক্ষিপ্ত বোধিসত্ত্ব ও সিংহ বর্জন করে ব্যাঘ্র-জাতকের কাহিনী ও সীলগুলির রেখাচিত্র নিম্নে পাশিপাশি উপস্থাপিত হল।

Mackay, Moh. Daro, Pl. Lxxvix, 360.

Mackay, Moh. Daro, Pl. xcvi 522.

Mackay, Moh, Daro. Pl. xc. 23.

এক অরণ্যে একটি বৃক্ষদেবতা বাস করতো। তার বাসস্থানের একটু দূরে আর একটি বিরাট বনস্পতি ছিল অন্য বৃক্ষদেবতার বাসস্থান। সে বনে ছিল বাঘের বসবাস। বাঘের ভয়ে কেউ সেখানে চাষ-আবাদ করতো না, কাঠও কাটতো না। বাঘ এখানে ওখানে শিকার করে নিয়ে এসে খেতো এবং উচ্ছিষ্ট অবশিষ্টাংশ ফেলে চলে যেতো। ফলে বনভূমি মড়ার বিকট গন্ধে ভরে গেল।

একদিন এক বৃক্ষদেবতা অন্য বৃক্ষদেবতার কাছে এসে বলল, মিত্র, এই ব্যাঘ্রের জন্য আমাদের বনখণ্ড মড়ার দুর্গন্ধে ভরে গেছে। আমি ত্যকে বিতাড়িত করবো।

অপর বৃক্ষদেবতা অভিযোগকারী দেবতাকে বললো, মিত্র, ঐ ব্যাঘ্রের দৌলতেই আমাদের আস্তানা স্থরক্ষিত আছে। বাঘ চলে গেলে আমাদের বাসস্থান বিনষ্ট হবে। ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন না দেখতে পেলে মানুষেরা সমস্ত বন কেটে মাঠ করে আবাদ করবে। অতএব, ব্যাঘ্রকে বিতাড়িত করা তোমার উচিত হবে না।

ষেন মিত্তেন সংসগ্গা, যোগক্খেমো বিহিংসতি।
পুব্বেবঞ্চভবস্তস্স, রক্খে অক্খোব পণ্ডিতো॥

ষেন মিত্তেন সংসগ্গা, যোগক্খেমো পবড়দতি।
করেয্যত্তসমং বুত্তিং, সব্বকিচ্চেসু পণ্ডিতো॥

এতৎসত্ত্বেও ঐ মূর্খ দেবতা একদা ভৈরবরূপ দেখিয়ে সেই বাঘকে তাড়িয়ে দিল। মানুষেরা তার পদচিহ্ন না দেখে অরণ্যে প্রবেশ করে বনখণ্ডের একাংশ কেটে ফেলল, সে অন্য দেবতার কাছে এসে বললো: মিত্র, আমি তোমার কথা না শুনে বাঘকে তাড়িয়ে দিয়েছি। সে চলে যাবার পর মানুষ বন কাটতে শুরু করেছে। এখন কি করতে হবে বল। তখন সে দেবতা বললো, বাঘ ঐ বনে থাকে, এখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

Marshal, Moh. Daro. Pl. XIII, 17.

অপরাধী দেবতা সেই অরণ্যে গিয়ে জানু পেতে বসে সানুনয়ে বাঘকে বললো:

এথ ব্যাগ্‌ঘা, নিবত্তবত্থা পচ্চমেথ মহাবনং
মা বনং ছিন্দি নিব্যঘং ব্যাঘা মা হেস্থ নিব্বনা।

দেবতার এ প্রার্থনার পরও বাঘ বলল, তুমি যাও, আমি যাবো না। সে দেবতা অতঃপর একাকী বনে প্রত্যাবর্তন করলো।

Mackay, Chanhu Daro, Pl. LI, 18.

কিছুদিনের মধ্যে মানুষ সারা বন কেটে সেখানে চাষ আবাদ করতে লাগলো।

Mackay, Moh. Daro, Pl. xc, 23.

আলোচিত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পটের প্রাচীনত্বকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে। অধিকন্তু পট যে ভারতে আর্য আগমনের পুর্ববর্তী তাও নিশ্চিত হয়।

বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পটুয়াদের বিভিন্ন নাম প্রচলিত। পটকার, পটীকার, মস্করী। সংস্কৃত ভাষায় 'পট্টীকার' শব্দ প্রচলিত। 'পটকার' ও 'পটিদার' শব্দে 'পট্টীকার' শব্দের প্রভাব স্পষ্ট। প্রত্যয়দৃষ্টে মনে হয় 'পটিদার' শব্দ 'পটকারে'র পরবর্তী।

'পট্টী' শব্দটি দ্রাবিড ভাষাগোষ্ঠীতে অদ্যাপি প্রচলিত। দ্রাবিড 'পট্টী' শব্দের অর্থ হল বাসগৃহ। 'পট্টীকার' শব্দে মিশ্রণ তাই অনস্বীকায। যারা বাসগৃহ নির্মাণ করে তারাই পট্টীকার, অন্তত অভিধার্থে। গৃহবাসী চিত্র-শিল্পীদের বাসগৃহের দিকে তাকিয়েই হয়তো একদা বিস্ময়বিমূঢ় যাযাবর আর্যেরা তাদের 'পট্টীকার' অবিধায় অভিহিত করেছিল। পট্টীকারদের শিল্পকর্মকে 'পট্ট' নামে নির্দিষ্ট করা ভ্রাম্যমান আর্যদের পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব নয়।

পটুয়ারা চিত্রাঙ্কনের যাবতীয় সরঞ্জাম নিজেরাই প্রস্তুত করত। দূর অতীতে তারা হয়তো কাপডও তৈরি করত। শিক্কা, ঘুন্‌সী এবং রঙিন সুতো বিক্রী করা তো পুটুয়াদের পেশাই ছিল। বস্ত্র তৈরি করতো বলে আর্যেরা যদি ভারতবাসী এ চিত্রকরদের 'পট্টকার' বলে থাকে তাহলে তার মধ্যে অসঙ্গতির চিহ্ন নেই। কারণ সংস্কৃত 'পট্ট' বাংলা কাপডেরই প্রতিশব্দ।

যে বস্তুর উপরই আঁকা হোক না কেন, পট হল ছবি। ছবির প্রতিশব্দরূপে 'পটালেখ্য', 'চিত্রপট' শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতে ব্যাপক। বস্ত্রের উপর অঙ্কিত চিত্র দর্শন করে আর্যেরা যদি তাকে 'চিত্রপট' বা 'পট্ট' আখ্যা দিয়ে থাকে তাহলে তা নিছক লোকনিরুক্তি। আমাদের আরাম-কেদারা (<Arm-Chair), আনারস (<Ananas), পিটুনি-পুলিশের (<Punitive Police) মত অর্বাচীন শব্দচেতনা নিয়েই এহেন্ অপোগণ্ড বাক্‌নির্মিতি, অনভিজ্ঞতা-প্রসূত শব্দের নডবডে জোড়াতাডা।

প্রাক-আর্য-আগমনকালীন পটশিল্পের নামরূপ আর্য-পূর্বযুগে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। আর্য-পুর্ববর্তী দ্রাবিডগোষ্ঠীর ভাষাবর্গে তার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের দ্রাবিড় ভাষাবর্গের তামিল ও মালয়ালম ভাষায় আর্য-আগমনের পুর্ববর্তী শিল্প এই পট অর্থে 'পডম্' শব্দের ব্যবহার অদ্যাপি একচ্ছত্র। সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশে 'পডম্' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।[১১] চট্টগ্রামের একটি ছডায় 'পড্' শব্দটির অদ্যাবধি প্রচলিত ব্যবহার বিভিন্ন কারণে বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ।[১২] পট প্রদর্শনের ব্যাপারটি বোধ করি প্রাচীন লোকনাট্যেরই ভগ্নাবশেষ। চট্টগ্রামী 'পড়্' সম্পর্কিত একটি ছড়ায় সে ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়। আর্যপূর্ব প্রাকৃতজনের 'পডম্' শিল্পসংস্কারবর্জিত যাযাবর আর্যদের অজ্ঞাত ছিল। তাই তারা পরিচিত 'পট্ট' শব্দের দ্বারা অপরিচিত 'পডম' শব্দের জায়গা জবরদখল করার চেষ্টা করেছিল। বাংলা 'পট' কিন্তু তার প্রাকৃত পূর্বরূপের সঙ্গেই জন্মসূত্রে ঘনিষ্ঠ। অতএব সংস্কৃত 'পট্ট' নয়, দ্রাবিড় 'পডম্' শব্দ থেকেই বাংলা 'পট' শব্দের উদ্ভব-নির্দেশ বোধ করি সর্বার্থসার্থক।

১

কালীঘাটের পটের প্রচলন খুব বেশী দিনের নয়। পট বাংলা দেশের লোকচিত্রকলা। পল্লী বাংলার পটুয়ারা শহর কলকাতার কালীঘাটে এসে যখন পট আঁকতে সুরু করলেন এবং পট পণ্য হিসাবে বাজারে ব্যাপ্তি পেল তখন থেকে এ বিশিষ্ট রীতির চিত্রকলা 'কালীঘাটের পট' নামে নতুন পরিচিতি লাভ করল। কালীঘাটে পাওয়া যেত বলেই জনসমাজের দেওয়া এই নতুন নাম স্বভাবত ব্যাপকভাবে চালু হল। দেশ দেশান্তরে এই নতুন নামেব ব্যাপক প্রচলনের হেতু দেশ বিদেশের নানা মানুষের আনাগোনায জমজমাট নতুন শহর কলকাতায় কালীঘাটের অবস্থিতি।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কালীঘাটের বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৩] মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে মন্দিরের আশে পাশে দোকানপাট হাটবাজার বসতে সুরু করে। যাত্রীদের ভীড়ও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তখনও বাংলা দেশে ঘটে পটে পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। জীবিকার তাগিদে, উপাজনের আশায গ্রাম বাংলার পটুয়ারা শহর কলকাতার কালীঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। শুধু কালীঘাটে নয়, তারকেশ্বরে তারকনাথেব মন্দিরের আশে পাশে চিৎপুরে চিত্রেশ্বরীর মন্দিরের চারপাশে, এবং এমনি আরও অনেক জাযগায পটুয়াদের বসবাস সুরু হল। এসব মন্দিরে সমাগত পুণ্যার্থী ধার্মিক নরনারীরাই ছিল ধর্মীয আখ্যান ও দেবদেবীর মূর্তিসমন্বলিত পটের প্রধান ক্রেতা।

ডবলু জি. আর্চার কালীঘাট পটের উদ্ভবকাল প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করেছেন, এ রীতির উদ্ভব ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের আগে নয়।[১৪] লক্ষ্যণীয়, তিনি বাংলার এই চৌকো পটকে কালীঘাটেরই নতুন সৃষ্টি বলে গ্রহণ করেছেন। এ মত জাহির করার ফলে বাংলার এ চিত্র-ঐতিহ্য অর্বাচীন প্রতিপন্ন হয়। অধিকন্তু তাঁর প্রাসঙ্গিক অন্য সিদ্ধান্ত: ব্রিটিশ সংযোগের প্রভাবে ও প্রেরণায় পট উপজাত।[১৫]

বিদেশীদের লেখা এ জাতীয় অনেক আলোচনা আমাদের দেশের নানা ইতিহাসের মতই বিভ্রান্তিকর। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: 'দেশের ইতিহাস আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।...তাহা এমন

স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।'[১৬] এহেন অস্থানে কৃত্রিম আলোকপাতের নমুনা ডবলু. জি. আর্চাবের কালীঘাট পট সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রেও অনুপস্থিত নয়। তার ধারণা শুধু নয়, স্থির সিদ্ধান্ত : ব্রিটিশ আগমনের ফলে এদেশে পাতলা কাগজেব উৎপাদন সুরু হয় এবং সে কাগজের সুস্থির সরবরাহ না থাকলে কালীঘাট পটের জন্ম হত না।[১৭] কৃত্রিম আলোকপাতের এবংবিধ উদ্ভট ও হাস্যকর দৃষ্টান্ত আরও আছে। তাঁর সিদ্ধান্ত : প্রথম আবির্ভাবের দিন থেকেই কালীঘাট পটের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ভাস্বরতা পেয়েছে তা ব্রিটিশ প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।[১৮]

ডবলু জি. আর্চারের কালীঘাট পট বিষয়ক সিদ্ধান্ত ঘোড়ার সামনে গাড়ী যুতে দেওয়ার মত। অসঙ্গত সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য করতে গেলে প্রমাণগুলো মিথ্যে হয়ে যায়। আর্চার সাহেবের আলোচনাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোন বিষয়বস্তুর চিত্রায়ণ বাংলার পটুয়াদের ঐতিহ্যের আওতায় পড়ে না। ব্রিটিশ প্রভাবের ফলেই বিচিত্ররূপিণী নারী, বিশেষ করে মাছ, সাপ, পশুপক্ষী ইত্যাদি কালীঘাটের পটে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল।[১৯] এ উদ্ভট হাস্যকর যুক্তির অসারতা স্পষ্ট করার জন্য পাহাড়পুরে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের 'হস্তী-মূষিক কথা'র চিত্ররূপের[২০] উল্লেখ করা যথেষ্ট। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মৃন্ময় পটে অঙ্কিত জীবজন্তু, পাখী, মাছ ও গাছপালার চিত্ররূপের কথাও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। ডঃ চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় কর্তৃক আলোচিত প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য নিম্নে বিধৃত হল :

"জীবজন্তু :

এই মৃন্ময় পট্টে বহু প্রকার জীবজন্তু অঙ্কিত হইয়াছে। যে সকল জীবজন্তু অঙ্কিত হইয়াছে তন্মধ্যে মহিষ, হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র, বানর, হরিণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার এবং শৃগাল উল্লেখযোগ্য।

পক্ষী :

অনেক মৃন্ময় পট্টে পক্ষী অঙ্কিত হইয়াছে।' এই সকল পক্ষীর মধ্যে হংস ও ময়ূর উল্লেখযোগ্য।

মৎস্য :

অনেক মৃন্ময় পট্টে মৎস্য অঙ্কিত হইয়াছে। মৎস্য দুই প্রকারে অঙ্কিত

হইয়াছে—একপ্রকার মৎস্যের মুখে একটি শিকল রহিয়াছে এবং অন্য প্রকার পট্টে দুইটি মৎস্য পাশাপাশি রহিয়াছে।

গাছপালা :

...যে সকল গাছপালা অঙ্কিত হইয়াছে তন্মধ্যে কদলীবৃক্ষ, বটবৃক্ষ এবং পদ্ম উল্লেখযোগ্য।"[২১]

শুধু কালীঘাট পটে নয়, ব্রিটিশ শিল্পরীতির প্রভাবমুক্ত বাংলার গ্রামাঞ্চলে বহুল প্রচলিত অনেক পটেও জীবজন্তু, গাছপালা ও নরনারীর চিত্রাঙ্কনে বাংলার পটুয়ারা দক্ষ ঐতিহ্যানুস্মৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

কালীঘাটের পট আসলে প্রাচীন বাংলার লোকচিত্রকলা চৌকো পটেরই বৈধ বংশধর। চৌকো পটের সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কালীঘাটের পটকে উনবিংশ শতাব্দীর নতুন শিল্পকলা বলে নির্দেশ করলে শুধু যে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয় কিংবা সত্যের অপলাপ ঘটে তাই নয়, বাংলার লোকচিত্রকলার এই ধারাটিকে অর্বাচীন বলে চিহ্নিত করার ফলে বাঙ্গালী জনসাধারণকে কৌশলে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টাও অনাবৃত থাকে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসে পটের ধারা সুদূর অতীত থেকে অধুনাতন কাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন। পাহাড়পুর খনন কালে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে চৌকো পটের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। 'কীলোৎপাটী বানরের কথা'র মত পঞ্চতন্ত্রের একাধিক কাহিনী সে সব চৌকো পটে স্থান পেয়েছে। সুতরাং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের বাংলা দেশে যে চৌকো পটের বহুল প্রচলন ছিল সে সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। ঈশপের কাহিনীর সিংহ-মুষিক কথার অনুরূপ একটি হস্তী-মুষিক কাহিনীর চিত্ররূপ পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক চিত্রকলায় দৃষ্ট হয়।[২২] এখানে অবশ্য সিংহের পরিবর্তে হস্তীর অবস্থান অন্য কারণেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূল লোককথার হাতী সম্ভবতঃ ঈশপের কাহিনীতে কালক্রমে সিংহে রূপান্তরিত হয়েছে। বিভিন্ন পশুর এহেন সিংহত্ব প্রাপ্তির উদাহরণ বাংলার শিল্প ক্ষেত্রে আরো আছে। ইশপের 'সারস ও বাঘে'র কাহিনীর নানা রূপান্তর এবং দুর্গার বাহন এহেন উদাহরণের অন্যতম।

প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে চৌকো পটের বিবরণ ও উল্লেখ আছে। প্রাগজ্যোতিষপুরের বাণ রাজার কন্যা উষা কামদেবের পুত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। অথচ স্বপ্নে দেখা তরুণ রাজকুমার উষায়

অপরিচিত, অজ্ঞাত। তখন উষার সখী চিত্রলেখা তৎকালীন ভারতবর্ষের খ্যাতিমান যাবতীয় রাজপুত্রের পট তৈরি করেছিল। সে পট দেখে উষা তার স্বপ্নে দেখা রাজকুমারকে চিনে নিয়েছিল। কাহিনীটি হরিবংশের (খ্রী. ২য় শতক)। এই কাহিনী পটকে নিশ্চিতরূপে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের ব্যাপক প্রচলিত চিত্রকলা হিসাবে নির্দেশ করে। বাংলার পল্লীগীতিকায় প্রেম কিংবা বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে পটের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 'কাজলরেখা' শীর্ষক গীতিকায় নায়িকা কাজল রেখার আলপনা অঙ্কনে পারদর্শিতা বর্ণিত হয়েছে।[২৩] এ সব ক্ষেত্রে যে পটের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিঃসন্দেহে চৌকো পট। বাংলা দেশের রাধাকৃষ্ণ কথায় চৌকো পটের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে পূর্বরাগ বর্ণনায় পট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে স্বরু করে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবিদের ক্ষেত্রে পট সর্বত্রই পূর্বরাগ বর্ণনার অন্যতম অপরিহার্য উপকরণ। বৈষ্ণব সাহিত্যে যে সব পটের উল্লেখ আছে সেগুলো দীঘল পট নয়, চৌকো পট।[২৪] স্বতরাং চৌকো পটকে কালীঘাটের পটুয়াদের নতুন সৃষ্টি বলে নির্দেশ করা অসমীচীন।[২৫]

কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীর চিত্র সম্বলিত সরার 'পট' নাম এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। লক্ষ্মীর পটে শারদ লক্ষ্মী পুজার প্রচলন বাংলা দেশে স্বদূর অতীত কাল থেকে অদ্যাবধি পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। পোড়ামাটির সরার উপর মূর্তি নির্মাণ ও চিত্রাঙ্কনের রেওয়াজ খ্রীষ্টজন্মের অন্যন তিন হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। তখনও এদেশে কাগজ আবিষ্কৃত হয় নি। মহেঞ্জোদরো-হরপ্পা-সিঙ্গানপুরে যে সব সীল আবিষ্কৃত হয়েছে তৎসন্নিহিত চিত্রকলার সঙ্গে বাংলার এ লোকচিত্রকলার একটি গভীর সংযোগ ও সঙ্গতি বিদ্যমান। এ সঙ্গতিসূত্রে প্রতীয়মান হয়, চৌকো পট সেই স্বদূর অতীতের লোক চিত্রকলারই উত্তরধারা। মহেঞ্জোদরো খননকালে প্রাপ্ত মাতৃকামূর্তি লক্ষ্মীর সীলগুলোর পাশাপাশি বাংলা দেশের অনুরূপ লক্ষ্মীর পট (সরা) উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করে। চিত্রগুলির রেখা-বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশ-পটভূমি হুবহু এক। এ অনন্যতা উভয়ের অভিন্ন বংশধারার স্বনিশ্চিত অভিজ্ঞান। বাংলার কাঁথার আলপনায় যে পদ্ম দেখা যায় তার সঙ্গে মহেঞ্জোদরোর সীলের পদ্ম যেমন এক রকমের, মহেঞ্জোদরোর লক্ষ্মীর সীলও তেমনি বাংলার লোকচিত্রকলা লক্ষ্মীর পটের অনুরূপ।

সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরেরও আগে ভারতবর্ষে যে লোকচিত্রকলা প্রচলিত ছিল বাংলার পট সেই লোকচিত্রকলারই বৈধ উত্তরাধিকারী। কালক্রমে এ চিত্রকলার ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সে পরিবর্তন স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী।

'পট' শব্দের অর্থ ছবি। মাটির আধারে চিত্রিত হোক আর কাগজে কাপড়ে অঙ্কিত হোক বাংলার লোকচিত্রকলা পট নামে অভিহিত। আধারের পরিবর্তনে বা পার্থক্যে আধেয় চিত্রকলার ঐতিহ্য অর্বাচীন হয় না। পট বাংলার লোকচিত্রকলার ঐতিহ্যকে তিন হাজার বছরের অধিক কাল ধরে বহন করে আসছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভ্রান্ত সমর্থনে এ সিদ্ধান্ত পরিপুষ্ট।

২

পটুয়াদের আদি নিবাস কালীঘাটে নয়। গ্রাম থেকেই তারা শহর কলকাতার কালীঘাটে এসেছিল। এখনও বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় পটুয়াদের বসবাস আছে। চব্বিশ পরগণার ফতেপুর, মজিলপুর, কঙ্গনবেড়িয়া, হাওড়া জেলার লিলুয়া, চণ্ডীপুর, হুগলী জেলার ত্রিবেণী, মোরা, খন্যান, পুঁইনান, বর্ধমান জেলার পলিতা কুরচি, চারুল; মেদিনীপুরের নাড়াজোল, কুমারীমারা, চৈতনপুর, কেশবপুর, চেতুয়া বাসুদেবপুর, চেতুয়া দাসপুর, দেউলপোতা, বীরভূম জেলার পাঁচুড়, দাদপুর, দাড়কা, আবাডাঙ্গা; মুর্শিদাবাদ জেলার গণকর, কান্দি, ভরতপুর, সালার, গোকর্ণ, পাঁচথুপী প্রভৃতি অনেক গ্রামে বহু পটুয়া বসবাস করে। ঢাকা, মৈমনসিংহ, রংপুর চট্টগ্রাম, বরিশাল অঞ্চলেও পটুয়াদের সংখ্যা কম নয়। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে 'পটুয়াপাড়া' বা 'পোটোপাড়া'র ব্যাপক অস্তিত্ব প্রমাণ করে একদা এদেশে এই লোকচিত্রকর সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা নেহাত কম ছিল না। আজ সে সব পটুয়াদের বৃত্তি ও পদবীর ব্যাপক পরিবর্তন অনতি অতীতের চিত্রকর বা পটুয়া সম্প্রদায়ের জনসমষ্টি নির্ণয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সব পটুয়ারা একদা চাষবাস করতেন, সুতো কাটতেন, কাপড় বুনতেন। আর্থিক দিক থেকে তাঁরা ছিলেন প্রধানত কৃষিনির্ভর। আজও বাংলা দেশের পনের আনা পাল-পার্বণ ও আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান ফসল ওঠার পরই অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ থেকে ধান ওঠার পরই গ্রাম বাংলার নানা জায়গায় মেলা

বসে। চাষবাসের ফাঁকে ফাঁকে পটুয়ারা পট আঁকতেন আর সেই পট হাটে-বাজারে-মেলায় বিক্রি করতেন। পরবর্তী কালে ব্রিটিশ শাসনের সুরুতে এ সব পটুয়া অন্যান্য অনেক কৃষিজীবীর মত ভূমিহীন খেতমজুরে পরিণত হল। গ্রামে গ্রামে তখন বেকারি আর অনাহারের দুঃসহ যন্ত্রণার অন্ধকার জমে উঠছে। গ্রামীন অর্থনীতির বনিয়াদে সর্বনাশা ধ্বসের তাণ্ডব আরম্ভ হল।

এ অর্থ নৈতিক ভাঙ্গনের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান পতনের সূত্রপাত। গ্রাম বাংলার দুনিবার বিপর্যয়ের যুগেই পটুয়ারা জীবিকার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিলেন। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে, শহর কলকাতা সবে জমজমাট হতে সুরু করেছে।

মোগল শাসনের অন্তিম লগ্নে বাংলা দেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় গভীর ব্যাপক ভাঙ্গন সুরু হল। এ অনিবার্য ভাঙ্গনের সুযোগ গ্রহণ করল গ্রাম সমাজের কর-আদায়কারীরা। এসব কর-আদায়কারী 'প্রধান ব্যক্তিরা' ব্যাপক ক্ষমতা হস্তগত করল এবং তার ফলে তারা অবিলম্বে উৎপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। পক্ষান্তরে গ্রাম সমাজের বৃহৎ জনসমষ্টির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হল, কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হল। অধিকন্তু মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন এক দল মানুষের আবির্ভাব ঘটল। তারা প্রধানত দাস, ক্রীতদাস, ভূমিদাস আর কৃষক, যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল ছত্রভঙ্গ মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল সৈন্যবাহিনী।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল সাম্রাজ্যের সুবাদার, জায়গীরদার, কর-আদায়কারী, জমিদার-গোমস্তার দল আর আমলা কর্মচারীদের অবাধ লুণ্ঠন, অকথ্য অত্যাচার। গ্রাম সমাজের সংকট তীব্রতম আকার ধারণ করল।

ইংরাজ বণিকরা লুণ্ঠনের সুবিধার জন্যে এদেশ থেকে একদল গোমস্তা বেনিয়ান সংগ্রহ করেছিল। এসব গোমস্তা বেনিয়ানরা ছিল তাদের যাবতীয় অপকর্মের আড়কাঠি এবং লুণ্ঠনের বেপরোয়া সাকরেদ সহচর। তাদের মিলিত লুণ্ঠনে, অবর্ণনীয় উৎপীড়নে গ্রাম বাংলার জনজীবন বিপর্যয়ের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল। অসহায় কৃষক সর্বস্বান্ত হল। রাজস্ব আদায়ের জন্যে নিষ্ঠুর দস্যু সর্দার 'নাজিম' নিযুক্ত করা হল। এ নিষ্ঠুর লুণ্ঠনের অবশ্যম্ভাবী ফল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাংলা দেশের সমগ্র ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ ব্যবসায়নীতির ক্রূরতম উদভাবনী শক্তির নতুন অধ্যায় সংযোজিত করল। 'পবিত্রতম ও অলঙ্ঘনীয়

মানবাধিকারগুলোর উপর কত ব্যাপক, কত গভীর, কত নিষ্ঠুরভাবে অর্থ-লালসার উৎকট অনাচার অনুষ্ঠিত হতে পারে, এ নতুন অধ্যায় তার একটি কালজয়ী নজির হয়ে থাকবে'।[২৭] বাংলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক এ মন্বন্তরে মৃত্যু বরণ করল। বীরভূম জেলার তৎকালীন সুপারভাইজার হিগিন্স সাহেবের একটি প্রাসঙ্গিক পত্রাংশ উদ্ধার করলেই সমগ্র গ্রাম বাংলার সমকালীন চিত্রটি স্পষ্ট হবে: 'গত দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা এত ভয়ঙ্কর যে তা অবর্ণনীয়। শত শত গ্রাম জনশূন্য, এমন কি বড় বড় শহরের তিন-চতুর্থাংশ গৃহ খালি পড়ে আছে। চাষীর অভাবে বিশাল উন্মুক্ত কৃষিক্ষেত্র পতিত অবস্থায় চাষের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়েছে'।[২৮] জনশূন্য গ্রামকে গ্রাম গহন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল।[২৯]

এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক বিপর্যয়ের তাড়নায় পটুয়ারা গ্রাম ছেড়ে শহর কলকাতার কালীঘাটে এবং অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের আশেপাশে বসবাস করতে সুরু করলেন। অন্যান্য অঞ্চলের পটুয়াদের মত কালীঘাটের পটুয়াদের মত কালীঘাটের পটুয়াদের আর্থিক অবস্থাও ছিল নিতান্ত অসচ্ছল। চিত্রচর্চার মাধ্যমে প্রাণধারণের জন্যে অত্যাবশকীয় যৎসামান্য উপার্জন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

কালীঘাটের পটুয়ারা যে অঞ্চলে এসে বাসা বাঁধলেন সে অঞ্চল তখন একেবারে জনবিরল। মাটির দেওয়ালঘেরা চালাঘরেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত হতে লাগল। চালাঘরের দাওয়ায় বসে সারা রাত জেগে রেড়ির সেজ কিংবা টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় তাঁরা পট আঁকতেন। দুঃসহ দারিদ্র্য ছিল তাঁদের শিল্পীজীবনের নিত্য সহচর।

বাংলা দেশের তৎকালীন সমাজবাস্তব তাঁদের জীবনে যেমন দুনিবার ভাঙ্গনের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল তেমনি তাদের অন্তরে বিদ্রোহের, বিক্ষোভের আগুনও ছড়িয়েছিল। অত্যাচার-উৎপীড়ণ, শোষণ-লুণ্ঠনই সেকালের একমাত্র সত্য নয়। ভাঙ্গনের পাশাপাশি প্রতিরোধের প্রয়াসও সেখানে অত্যুজ্জ্বল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০) সমস্ত বঙ্গদেশের ছত্রভঙ্গ মোগল বাহিনীর বেকার বুভুক্ষু সৈন্যদল এবং গৃহহারা ক্ষুধার্ত কৃষকদেরই মিলিত মুক্তিসংগ্রাম। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আগ্নেয় বিক্ষোভে বাংলা দেশ তখন বহ্নিমান। শুধু সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নয়, নানা আন্দোলনে-অভ্যুত্থানে ইংরাজ শাসক ও তাদের সাঙাতদের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা দেশে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের

জোয়ার জাগল। মেদিনীপুরের ঘড়ুই বিদ্রোহ, খয়রা ও মাঝি বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৩-৮৩, ১৭৯৮-৯৯), ত্রিপুরায় সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯, ১৮১৯, ১৮৭০), বাংলার কৃষক-তন্তুবায় সংগ্রাম (১৭৭০-১৮০০), নীল বিদ্রোহ (১৭৭৮-১৮০০, ১৮৩০-৪৮, ১৮৫৯-৬১), মলঙ্গী আন্দোলন (১৭৮০-১৮০৪), রেশম চাষীদের সংগ্রাম (১৭৮০-১৮০০), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), যশোহর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৮৪, ১৭৯৬), বীরভূমের গণবিদ্রোহ (১৭৮৫-৮৬), বীরভূম-বাঁকুড়ার পাহাড়িয়া বিদ্রোহ (১৭৮৯-৯১), বাখরগঞ্জের সুবান্দিয়া বিদ্রোহ (১৭৯২), মৈমনসিংহের গারো জাগরণ (১৭৭৫-১৮০২, ১৮৩৭-৮২), মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৬), মৈমনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২), 'হাতীখেদা' আন্দোলন (১৮০০-১৮৩০), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৯), জামাড়িয়া বিদ্রোহ (১৮৬৩), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) প্রভৃতি কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সেই অসমসাহসিক প্রতিরোধ আন্দোলনের নজির। এ সব কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরাজ শাসক ও তাদের নিষ্ঠুর লুণ্ঠনের সহযোগী গোমস্তা, জায়গীরদার, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর সাঙাতদের অত্যাচারে উৎপীড়ণকে প্রতিহত করা।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শোষকদের সাঙাত মধ্যশ্রেণীর তথাকথিত ভদ্র বাবদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও বিদ্বেষের অগ্নেয় উত্তেজনা নিয়ে দরিদ্র নিঃস্ব লোকশিল্পীর দল গ্রাম ছেড়ে প্রাণধারণের উপযোগী অত্যাবশকীয় উপার্জনের আশায় শহর কলকাতার কালীঘাটে এসেছিলেন। এসব 'ভদ্রবাবদের' বিরুদ্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তাঁদের সামাজিক চিত্রকলায় রূপায়িত হয়েছে তা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়াজাত। এসব মধ্যশ্রেণীর বেনিয়ান গোমস্তা সম্পর্কিত দু'একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ উদ্ধার করলেই এরূপ প্রতিক্রিয়ার তাৎপর্য স্পষ্ট হবে।

ক. 'শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় যে, সেই সকল মহাজন বিপন্ন কৃষকদের নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা সুদ আদায় করিয়াছিল।...তাহাদের কঠোর শ্রমোৎপাদিত শস্যরাশি বলপূর্বক বাজারে লইয়া গিয়া এক-চতুর্থাংশের ও কম মূল্যে বিক্রয় করা হইতে লাগিল, হতভাগ্যদের সম্বৎসরের আহার অপহৃত হইল, আর তাহাদের ঋণের বোঝা বাড়িতেই লাগিল। অবশেষে তাহাদের লাঙ্গল, বলদ, মই প্রভৃতি বিক্রয় করিল।'[৩০]

জমিদার-ইজারাদারদের অত্যাচার-উৎপীড়ণে অতিষ্ঠ হয়েই কৃষক জনসাধারণ বিদ্রোহ সামিল হয়েছিল।

খ. 'যখন চাষীদের উপর এই কর বৃদ্ধি ও তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার অবাধে চলিতে লাগিল, যখন বন্য পশুর মত দলে দলে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও নিষ্কৃতি পাইল না, চক্ষুর সম্মুখে নিজেদের কুটীর ও যথাসর্বস্ব অগ্নিমুখে ভস্মীভূত হইতে লাগিল, তখন আর তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না।'[৩১]

তন্তুবায়দের উপরও এরূপ অসহ্য অত্যাচার চলেছিল। ইংরাজ শোষকেরা তাদের দেশীয় দালাল বেনিয়ান ও গোমস্তা নামক অতি নিকৃষ্ট জীবগুলোর মারফৎ শোষণের জাল বিস্তার করেছিল।[৩২]

বিপর্যস্ত গ্রামজীবনের তীব্র তিক্ত অভিজ্ঞতার বিক্ষুব্ধ জ্বালা নিয়ে লোকচিত্রকরের দল এলেন ভাঙনের বুকে জেগে ওঠা শহর কলকাতার কর্দমাক্ত সমাজ পরিবেশের নতুন চরে। শহর কলকাতার নতুন সমাজে এসে তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন ইংরাজ শাসকদের সহযোগী বেনিয়ান আর বাবুদের। তারা তখন অধঃপতনের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন। সমকালের সমাজ-ইতিহাসে তার বিবরণ দুষ্প্রাপ্য নয়।

ক. তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না।...ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না।...সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাঁজার আড্ডা ছিল।'[৩৩]

খ. 'ব্যভিচার এ দেশের দাম্পত্যসুখের মূলোচ্ছেদ কচ্চে'।[৩৪]

গ. 'ব্যভিচার এদেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে রয়েছে। ব্যভিচার অসংখ্য লোকের জীবন বিনাশ কচ্চে।...মাদকেরা এই ব্যভিচারের ছায়ার ন্যায় অনুবর্তিনী। রাজা কোথায় এই সকলের নিবারণ করে শান্তি রক্ষা করবেন, এই ত রাজনীতি আমরা জানি, কিন্তু ইংরাজেরা চক্ষু বুজে হাত গুটিয়ে এই কলঙ্কডালি মাথায় নিচ্চেন।...মদ গাঁজাতে বিলক্ষণ উৎসাহ দিচ্ছেন। আবকারী ইহাঁদের অপরিহার্য ব্যবসায় হয়েচে।'[৩৫]

ঘ. 'কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোনখানে কিস্ না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও বলবার যো নয়!'[৩৬]

ঙ. 'আজব সহর কলকাতা!...

খ্যামটা খান্কির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।'[৩৭]

এ হেন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্থ এই বাবুসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তু লোকশিল্পীর দল স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হলেন এবং তাঁদের চিত্রকলায় তাঁরা বাবু-বেনিয়ানদের অসামাজিক জীবনাচরণের উচ্ছৃঙ্খলতাকে তীব্র তীক্ষ্ণ মর্মান্তিক বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করলেন। 'পদাঘাত'[৩৮] ও দোহিপদপল্লব[৩৯] এ জাতীয় অসংখ্য চিত্রের দুটি নমুনা।

জনগণের জীবনের সঙ্গে পটুয়াদের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতাই ভণ্ড ও বেনিয়ান বাবুদের বিরুদ্ধে বাংলার লোকচিত্রকলায় আগ্নেয় বিক্ষোভ সঞ্চার করেছিল। সহর কলকাতার বাবু-বেনিয়ান জীবনের পট সম্পর্কে একথা যেমন সত্য, অধঃপতিত ভণ্ড বৈষ্ণবদের ব্যঙ্গ করে চিত্রিত পট সম্বন্ধেও সে সত্য সমভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ 'বিড়াল'[৪০] পটটি উল্লেখযোগ্য। বিড়ালটির কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী এবং মুখে একটা আস্ত চিংড়ি। চিত্রকলা কতখানি সূক্ষ্ম ও মর্মান্তিক বিদ্রূপের বাহন হতে পারে 'বিড়াল' তার নমুনা। কিশোরী-ভজন, পরকীয়া সাধনা, 'গুরুপ্রসাদী প্রথা ইত্যাদি যৌনাচার বৈষ্ণবদর্শনকে একদা পঙ্কিল করে তুলেছিল। 'রাধা'র রাধারমণ দাস সরকার তারই নমুনা। এ উপন্যাসের একটি বর্ণনা:

'···সে মেয়েকে বলতে লাগল কিশোরী-ভজনের কথা। জানিয়ে দিল যে, বাইরে যেমন নানান আচার ও ধর্মাচরণের পদ্ধতির সঙ্গে কোন একটি নিরীহ বৈষ্ণব মহান্তের সঙ্গে তার মালাবদল হবে, তেমনি ভিতরে কোঠাঘরের উপরে আতর গোলাপ বসনভূষণের সমারোহের মধ্যে বাজারের কোন বিলাসী ধনী এসে তার সঙ্গে বাসরসজ্জা পাতবে।'[৪১]

বাংলা দেশে একদা গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল। নতুন বিয়ের পর গুরুসেবা না করে স্বামী সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। কালীপ্রসন্ন সিংহ সে গুরুসেবার একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন:

"গোস্বামী বরের মত সজ্জা করে জামাইবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন। হরহরিবাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুকলেন···।

স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলে। প্রভু খাটে থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন; কন্যাটি কি করে! 'বংশপরম্পরাগত ধর্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ' এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—সুড় সুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন

'বল, আমি রাধা তুমি শ্যাম' ; কন্যাটিও অনুমতি মত 'আমি রাধা তুমি শ্যাম' তিনবার বলেচে… ।'[৪২]

কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎকালীন গোঁসাইগিরি ও গোঁসাইদের মুখোস উন্মোচিত করেছেন :

'হিন্দু ধর্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও একটা রোগা দুর্বল গোঁসাই দেখতে পাইনি।…গোঁসাই স্বয়ং কেষ্ট ভগবান বলেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে ঘরে বসে পান ও কালীয়দমন, পুতনাবধ, গোবর্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন।'[৪৩]

ভণ্ড বৈষ্ণবদের ব্যঙ্গ করে চিত্রিত কালীঘাট পটুয়াদের একটি বিখ্যাত পট 'গোঁসাই'।[৪৪] গোলগাল, মুণ্ডিত মস্তক, স্ফীতোদর গোঁসাইটির এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে জপের মালা। তার গলায় কণ্ঠী, কাঁধে চাদর, কপালে তিলক, মাথার উপর একটা পাখী। পাখীটা দেখতে অনেকটা কাকের মত, গলা-মাথা কুচকুচে কালো। সব মিলিয়ে একটা অবিমিশ্র ভণ্ডামির প্রমূর্ততা। কবিয়াল এণ্টনী ফিরিঙ্গি বোধ হয় এ সব ভণ্ড বৈষ্ণবদের কথা মনে করেই গেয়েছিলেন :

তোমরা পয়সা পেলে হেসে খেলে
সাদায় কর কালো।
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে আমি বলি
কসাই তবু ভালো ॥

কবিয়াল এণ্টনী, ফিরিঙ্গির গানে যা অসম্পূর্ণ কালীঘাটের পটুয়ার পটে সংক্ষিপ্ততম রেখায়, স্বল্পতম রঙে তারই সম্যক প্রমূততা।

কালীঘাটের পটুয়ার আঁকা 'বিড়াল' ও 'গোঁসাই' এসব অধঃপতিত 'বৈষ্ণব তান্ত্রিকে'র প্রতীক। কালীঘাটের যাবতীয় সামাজিক পটের পশ্চাতে সমসাময়িক সমাজবাস্তবের উজ্জ্বল উপস্থিতি তর্কাতীত। যে জীবনমুখিতায় মধুসূদন দত্তের প্রহসন, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩), নিশাচরের 'সমাজ-কুচিত্র' (১৮৬৫), 'টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার' ছদ্মনামধারী চুণিলাল মিত্রের 'কলিকাতার লুকোচুরি'

(১৮৭১) প্রভৃতি সামাজিক নকশার প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অনুরূপ অথচ আরও অনেক গভীর ও ঘনিষ্ট গণজীবন কেন্দ্রিকতা থেকেই বাংলার লোকচিত্রকলা কালীঘাট পটের বিকাশ ও বিবর্ধন। ডবলু জি. আর্চার কথিত ইংরাজ বেনিয়াদের বদান্যতায় নয়, তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতেই কালীঘাটের সমাজ বাস্তব সম্পর্কিত পটের উৎসার ও ইতিহাস বিচায।

৩

কালীঘাটের পট প্রধানত যৌথ শিল্প। লোকায়ত শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াসের অস্তিত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এ যৌথ প্রয়াসের রীতিনীতি, প্রথা পদ্ধতি কালক্রমে পরিবর্তনশীল। কালীঘাটের পটে এ যৌথ প্রযাস প্রকল্প একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়েছে।

কালীঘাটের পটের ক্ষেত্রে প্রধান পটুয়া কালির টানে নকশা এঁকে মূল ছবির খসড়া তৈরি করতেন। বাড়ীর মেয়েরা সে খসড়ায় রং লাগাত। চার পাঁচটা মাটির খুরিতে কিংবা নারকেলের মালায় নানা রকমের রং গোলা হত। এক একটা রং নিয়ে এক একজন মেয়ে রঙের কাজে বসে যেতেন। একজন মেয়ে একটিমাত্র রং দিয়ে যেতেন ছবির যথানির্দিষ্ট অংশে। এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েরা শত শত খসডায় রঙের কাজ শেষ করতেন। এমনি করে অনতিবিলম্বে রঙবেরঙের অনেক পট তৈরি হত। কখনও কখনও মেয়েরাও পটের খসড়া আঁকতেন। পট ও খসডার একটা নিদর্শন পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হল।[৪৫] শিক্ষার্থীরাও খসড়ায় রং দিত এবং কালক্রমে পট আঁকা শিখে নিত। সরার ক্ষেত্রে এ রীতিনিয়ম এখনও প্রচলিত।

যে সব পটুয়ারা পটের খসডা তৈরি করতেন তাঁদের চিত্রণক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কোন মডেল বা নমুনা সামনে রেখে চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজন তাঁরা কখনও অনুভব করেন নি। নর-নারী, জীব-জন্তু বা গাছ-পালা সামনে সাজিয়ে রেখে নকল করার দীনদশা তাঁদের জীবনে অভাবিত। সামান্য একটা তুলি একবার কালো কালিতে ডুবিয়ে দ্রুততম টানে তাঁরা প্রাণীজগৎ ও নিসর্গ প্রকৃতির যে কোন ভাব ও ভঙ্গী, বস্তু ও বিষয় অভ্রান্ত দক্ষতায় সবাক করে তুলতে সম্যক সমর্থ ছিলেন। একটি পট আঁকার জন্য এক কালিতে তাঁরা সচরাচর দুবার তূলি ডোবান নি। একবার তূলিতে কালি নিয়ে যতক্ষণ কালি থাকে সেই

সামান্য সময়ের মধ্যে ক্ষিপ্রতম রেখাবিন্যাসে এক একটি পট সম্পূর্ণ করেছেন। কালীঘাটের পটুয়াদের এই শৈল্পিক দক্ষতা ছিল বংশানুক্রমিক ও স্বভাবসিদ্ধ।

কালীঘাটের এক একখানি পটের দাম ছিল এক পয়সা বা দু'পয়সা। তাই সময় ও উপকরণ সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন মিতব্যয়ী। গরীব কৃষক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষরাই ছিল পটের প্রধান ক্রেতা। সুতরাং পটের দাম তাদের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের মধ্যে রাখতে হত। এক টুকরো সস্তা কাগজ, সামান্য একটা তুলি আর একটুখানি রঙের অতিরিক্ত মহার্ঘ উপাদান-উপকরণের দিকে পটুয়াদের হাত বাড়ানোর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। এই আর্থিক প্রসঙ্গ তাঁদের চিত্রণ-রীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এই জন্যেই তাদের পট সর্বতোভাবে অপব্যয় বিরহিত। উদাহরণ স্বরূপ 'সেতার-বাদিনী'[৪৬] বা 'গোলাপী'[৪৭] নামাঙ্কিত পট যুগলের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসাধনরতা রমণীর শাড়ী আঁকতে গিয়ে কালীঘাটের পটুয়া শাড়ীর পাড়টুকুই শুধু এঁকেছেন এবং সে আংশিক পাড়ের মাধ্যমে সমস্ত শাড়ীটিকে আভাসিত করেছেন। পাড় এখানে সমগ্র শাড়ীর প্রতীক। 'সেতার বাদিনী'র শাড়ীর মত কোথাও বা তাঁরা কাপড়ের বাকী অংশে তুলির আবছা দাগ টেনে কাপড়ের ভাঁজ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সাধারণত কাগজের স্বাভাবিক সাদা রঙকেই কাপড়ের জমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কালীঘাটের পটে বলিষ্ঠ রেখাবিন্যাসের সঙ্গে অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

কালীঘাটের পট ও অজন্তার রেখা-কৌশলে আদলের অভিন্নতা দুর্লক্ষ্য নয়। কালীঘাট পটের রেখাবিন্যাস তাই স্বভাবত অজন্তার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। শুধু রেখাবিন্যাসে নয়, অঙ্কনরীতি ও বর্ণবিন্যাসের দিক থেকেও বাংলার পট অভিন্ন বংশোদ্ভূত বলে মনে হয়। মহেঞ্জোদরো, সিঙ্গানপুর, কাংড়া, অজন্তা, অমরাবতী, বালীদ্বীপ ও সিংহলের শিল্পরীতির সঙ্গে বাংলার এই লোক-চিত্রকলার সাদৃশ্য গভীর ও অব্যাহত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারারই গৌরবোজ্জ্বল সগোত্রতার ইঙ্গিতগর্ভ। নানাবিধ সরু-মোটা, কম্পিত-বক্রান্ত এবং সরল-সাবলীল আপাতনিরর্থক রেখাপাতের মাধ্যমে কাংড়া ও বাংলার পটুয়ারা কেবলমাত্র অদ্বৈত চিত্রণকুশলতার পরিচয় দিয়ে শৈল্পিক সাফল্যের অধিকারী হয়েছেন তাই নয়, কাংড়া ও কালীঘাটের কলম যে এক ও অভিন্ন সে ধারণাকেও দৃঢ়ভিৎ করেছেন।

বাংলার লোকচিত্রকলা বাইরের প্রভাবে যে একেবারে প্রভাবিত হয় নি

তা নয়। বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে বহুবিচিত্র প্রভাবের বেনো জল পটুয়াদের ঘরে-ঘরাণায় ঢুকেছে। আওরঙ্গজেবের আমলে শিল্পকলার উপর নিষেধাত্মক বিধান জারি হল। শিল্পীরা দিল্লীর দরবার থেকে রাজপুতনায় এসে আশ্রয় নিলেন। দরবারী কায়দাকানুন ও পরিচ্ছন্নতা অনেকটা হারিয়ে গেল। সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করল হিন্দু আধ্যাত্মিকতা। ফলে তাদের হাতে একটা মিশ্র শিল্পরীতির উদ্ভব হল। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে মানসিংহ এই মিশ্র জয়পুরী চিত্রাদর্শ বাংলা দেশে আমদানী করলেন। বাংলার চিত্রকর জীবিকার তাগিদে, অর্থানুকূল্যের মোহে ধনী জমিদার-মহাজন-জায়গীরদারদের আদেশ শিরোধার্য করে জয়পুরী চিত্রাদর্শের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল। জয়পুরী চিত্রে স্বর্ণালঙ্কারের প্রাচুর্য ছিল, দরবারী কায়দাকানুন ছিল, রাজকীয় আভরণ ও পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল, কিন্তু প্রাণ চাঞ্চল্যের লাবণ্য ছিল না। ফলে জয়পুরী মিশ্র চিত্রাদর্শ অধিকাংশ লোকচিত্রকর ও শিল্পদরদী লোকমানসকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়নি। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন জয়পুরী চিত্রাদর্শ বিশ্লেষণ এবং বাংলার লোকচিত্রকলার সঙ্গে জয়পুরী মিশ্ররীতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত সে মূল্যবান আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

> ক. 'জয়পুরী রাধা আঁচল ও পোষাকের গৌরবে ডগমগ হইয়া কৃষ্ণের বাম দিকে যেন অরুচিকর কাঁয়দা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কতকটা সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কৃষ্ণ নানা বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া মকরমুখে স্বর্ণমণ্ডিত বাঁশী বাজাইতেছেন—কাহাকে ডাকিতেছেন তিনিই জানেন'।[৪৮]

> খ. 'ঘাগরা পরা গোপী, নিরেট নিশ্চেষ্ট স্থানুবৎ বংশীধর কৃষ্ণ, সমস্ত শরীর পোষাক পরিচ্ছদে আবৃত নরনারী ইত্যাদি রূপ রাজপুত চিত্রে বাঙ্গালী পটুয়ার লীলাময় তুলির রেখা পড়ে নাই। বাঙ্গালীর তুলি জীবন দান করে, তাহার মত দুঃসাহস ও প্রাণের আতিশয্য ভারতের অন্য কোন দেশ দেখাইতে পারে নাই। কৃষ্ণ রাধার পায়ে ধরিয়া সাধিতেছেন···বাঙ্গালী শিব অন্নপূর্ণার কাছে ভিখারীর ভাবে অর্ধ উলঙ্গ বেশে অন্ন ভিক্ষা করিতেছেন; আর জয়পুরী কৃষ্ণের বাঁশী স্বর্ণমণ্ডিত, তাঁহার বেশভূষা রাজকীয়, রাধিকা রাজ্ঞীর বেশে শ্রীকৃষ্ণের বাম দিকে ঘাগরা ও অলঙ্কারের আসবাব লইয়া জমকালোরূপে দেখা

দিতেছেন, শিব পঞ্চমুখে ঐশ্বর্য দেখাইতেছেন। এই সকল জাঁকজমক সত্ত্বেও বাঙ্গালী ছবির কাছে রাজপুত চিত্র প্রাণহীন'।[৪৯]

এই প্রাণহীনতার জন্যেই রাজপুত চিত্রাদর্শ বাংলার লোকচিত্রকরদের শিল্পীমানসের দ্বারদেশে প্রতিহত হয়েছে।

একদা কালীঘাটের পট বিদেশী বেনিয়াদের সর্বগ্রাসী লোভের কবলে পড়ে বিকৃতিগ্রস্ত হয়েছিল। কালীঘাট পটের জনপ্রিয়তা দেখে তারা জার্মান প্রেসে লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণ পট ছাপিয়ে কলকাতা ও বিশ্বের বাজারে বিক্রী করতে সুরু করে। তখন তারা খোদার উপর খোদকারি করতে গিয়ে কালীঘাটের পটে নানা রকমের চালচিত্র, চিত্রবিচিত্র পরিবেষ্টনী, লতাপাতা ফুলের কারুকার্যখচিত সতরঞ্চ ও শাড়ীর বাহার আরোপ করেছিল। সে দুর্গতির চাপে কালীঘাট পটের লোকচিত্রকলা সুলভ সারল্য ও নির্ভীক নিশ্চিন্ত বলিষ্ঠতা বিলুপ্ত হয়েছিল। অবশ্য এহেন বিকৃতিবিধানের দায়িত্ব বাংলার পটুয়াদের নয়। কালীঘাটের পটুয়ারা ছেলেভুলানো চাকচিক্যের বেনো জলে বংশ পরাম্পরাগত কলালক্ষ্মীর প্রতিমা বিসর্জন দেন নি। কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দেওয়া লোকশিল্পের স্বভাববিরুদ্ধ।

ইয়োরোপীয় চিত্রকলা প্রধানত বর্ণনির্ভর। বাংলার পট রং ও রেখার শুদ্ধ সমবায়ে বিকশিত। তাই ইয়োরোপীয় চিত্রকলার মত বর্ণ কালীঘাট পটের মুখ্য উপাদান নয়। বর্ণের ব্যবহার রীতিও উভয়ত্র পৃথক। খনিজ রঙের উপরই ইয়োরোপীয় চিত্রকলার সর্বাধিক নির্ভরতা আর বাংলার পট ভেষজ রঙের উপর অধিকতর নির্ভরশীল।

বাংলার পটুরারা স্বল্পতম রেখায় ব্যাপকতম ব্যঞ্জনা সঞ্চারের প্রয়াসী। তুলির একটিমাত্র টানে কালীঘাট পটের এক একটি মূর্তি সম্পূর্ণ ও সজীব হয়ে উঠেছে। প্রত্যাশাকে সচিত্র করার উপযোগী চিত্রভাষা সম্পর্কে কালীঘাটের পটুয়ারা সম্যক অবহিত ছিলেন। নির্ভীক তুলির অবিচল রেখাপাতে তাঁরা যে নিপুণ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন তা এই সিদ্ধান্তের তর্কাতীত সমর্থনসূচক।

অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতি কালীঘাটের পটুয়াদের চিত্রকলাকে কলালাবণ্যে মণ্ডিত করেছে, সরস পরিহাস রসিকতায় অভিষিক্ত করেছে। বিষয়বস্তুর কোন মডেল সামনে রাখার প্রয়োজন তাঁরা কখনও অনুভব করেন নি, বিদ্যুতের মত যা তাঁদের অন্তরে মুহূর্তের মধ্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠত, ক্ষিপ্র রেখাপাতে বাংলার পটুয়া তার চিত্ররূপ রচনা করতেন। এদিক থেকে চীনা ক্যালিগ্রাফির

সঙ্গে পটের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ক্যালিওগ্রাফি সম্পর্কেও অনুরূপ নির্দেশ : '...the Sung scholar Su Shioh says : To paint the bamboo, one must have entirely within one. Grasp the brush, look intently (at the paper), then visualize what you are going to paint. Follow quickly, lift your brush and persue directly that which you see, as a falcon dives on the springing hare —the least slackening and it will scape you'.[৫০]
উভয়ত্রই গতির বিন্দুমাত্র শৈথিল্য সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও অশুভঙ্কর।

কালীঘাট পটের চিত্ররীতি দ্বিমাত্রিক (two dimensional)। কিন্তু এ দ্বিমাত্রিক চিত্রকলায় যে কমনীয় প্রাণময়তা, আবেগোচ্ছল ছন্দ-সুষমা, আশ্চর্য সুন্দর গতিবেগ স্পষ্টতা পেয়েছে তা প্রশংসার্হ। বহুরেখ জটিলতা সৃষ্টি করেও অনেক অধুনাতন চিত্রশিল্পী যেখানে ভাবপ্রকাশে ব্যর্থ, বাংলার পটুয়ারা সেখানে একটিমাত্র রেখায় প্রত্যাশিত ভাবকে সম্যক ভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। ইঙ্গিতগর্ভ অভিব্যক্তির দিক থেকে বাংলার পট বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর অভিব্যঞ্জনা, গোষ্পদে বিপুলায়তন সূর্যের প্রতিফলন।

কালীঘাট পটের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতা। দুরূহ জটিল রেখাপাতে, অহেতুক উৎকট বর্ণবিন্যাসে কালীঘাটের পট দুর্বোধ্য হওয়ার অবকাশ পায়নি। রেখা ও বর্ণের সন্নিবেশ বিরলতা সত্ত্বেও পটের জীবন্ত গতিশীলতা অবলুপ্ত হয় নি। 'অশ্বারোহী'[৫১] ও 'পরী'র[৫২] পট তার নিদর্শন। কালীঘাট পটের প্রত্যেকটি নারীমূর্তি স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত।

যে সুরুচি, শ্লীলতা ও সংযম লোকচিত্রকলার বৈশিষ্ট্য, কালীঘাটের পটে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান। লোককলাকার সুলভ সুস্থ নৈতিক বোধের গৌরবে কালীঘাটের পটুয়ারা গৌরবান্বিত। কলকাতায় যখন 'বেশ্যাবাজিটি…বাহাদুরির কাজ, ও বড়মানুষের এলবাত পোষাকের মধ্যে গণ্য;…কল্‌কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজরাজড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না,… স্ত্রীকে বাড়ীর ভিতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন,'[৫৩] তখন 'উপেক্ষিতা'[৫৪] সগোত্র পটগুলোর সামাজিক তাৎপর্য অসাধারণ। এ পটের বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'লেখকের সঙ্গে যেরূপ অক্ষরের পরিচয়, চিত্রকরের সঙ্গে যদি

রেখার পরিচয় তেমনই হয়, তবে রেখার সঙ্কেতে তিনি অনায়াসে একটা ভাব জীবন্ত অক্ষরের মত ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। কালীঘাটের একটি ছবিতে দৃষ্ট হয়—স্ত্রীর হাতে বালা-চুড়ি নাই, কানে মাকড়ি নাই, গলায় হার নাই, পায়ে মল নাই—সেগুলি কোথায় গিয়াছে? বাবুটির বেশভূষার বাহার ও কোঁচার বলনী দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যাইবে—কোন নিরয়ের জন্য সে স্ত্রীর সমস্ত গহনাপত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে নিরাভরনা করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সে ক্ষান্ত হয় নাই, পুনশ্চ সাজগোজ করিয়া সেই অভিশপ্ত পথের দিকে রওয়ানা হইয়াছে। সর্বস্বহারা স্ত্রী সমস্ত গহনা নিজ হাতে খুলিয়া স্বামীকে দিয়াছেন, কিন্তু সে যে আবার পাপের পথের পথিক হইবে, ইহা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। এজন্য নগ্ন হাত দুটি দিয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়াছেন। এই ছবির প্রধান গুণ শিল্পের সৌন্দর্য নহে, ছবি হিসাবে ইহার দর সামান্য, কিন্তু রেখা দিয়া যে কথা কহা যায় শিল্পের সেই উচ্চাঙ্গের শক্তিটি চিত্রকরের ছিল।'[৫৫]

কালীঘাটের পটে আরো দেখা যায় স্বামী পদলুণ্ঠিতা পত্নীকে বঁটি দিয়ে কাটতে, স্ত্রীকে ঢেঁকিতে কুটতে উদ্যত হয়েছে। আচার্য দীনেশচন্দ্রের প্রাগুক্তোচিত মন্তব্য যথার্থ: 'এই চিত্রগুলি সমাজের চাবুকস্বরূপ নৈতিক নেত্রোন্মীলনের সহায়তা করিত'।[৫৬] এই পটগুলি যেন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' সগোত্র ভাবের চিত্ররূপ। কালীঘাট পটের 'বিড়াল' 'ভক্তপ্রসাদের[৫৭] দোসর', 'নর্তকী'[৫৮] ও 'পয়োধরী-নিতম্বিনী'র[৫৯] সমগোত্রীয়। 'ভেড়া বানানো'[৬০] এ জাতীয় বিদ্রূপাত্মক চিত্রমালার অন্যতম।

উচ্ছৃঙ্খল দরবারী অশালীনতা রাজসভাকবির কাব্যকে ক্লেদাক্ত করেছে, বাংলার লোকচিত্রকলার ক্ষেত্রে কোন গভীর রেখাপাত করতে পারে নি। যখন শহর কলকাতার 'বড় মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিতা মেয়েমানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নি ভাগ্নি—বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে',[৬১] এবং তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় আখড়াই-হাফ আখড়াই-খেউরের ছড়াছড়ি আর বিকৃতির ঘুটঘুটে অন্ধকারে সুস্থ সংস্কৃতির জ্যোতির্ময় মুখ আচ্ছন্ন, তখন কালীঘাটের পটুয়ারা তাঁদের চিত্রকলাকে শাণিত হাতিয়ার করে শুচিশীল মনুষ্যত্বের স্বপক্ষে আপোসহীন লড়াই করেছেন। এলোকেশী ও

মহান্তকে নিয়ে একদা দেশে যে উত্তেজনা আর আলোড়ন হয়েছিল তখনও কালীঘাটের পটুয়ারা বিকৃতির সঙ্গে আপোস করেন নি। 'মহান্তের ঘানি টানা,' 'মহান্তের গৃহে মূর্ছপনা', 'এলোকেশী-হত্যা' ইত্যাদি পট তার প্রমাণ। এই দুঃসাহসিক চিত্রকলার জন্য কালীঘাট অঞ্চলে পট নিষিদ্ধ হয়েছে, দরিদ্র পটুয়ারা জীবিকার্জনের উপায় থেকে অনেকদিন বঞ্চিত থেকেছেন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অসামাজিকতার কাছে, অশ্লীল দোর্দণ্ড প্রতাপের কাছে আত্মসমর্পন করেন নি। প্রতাপান্বিত 'হঠাৎ বাবুদের' দাক্ষিণ্যের লোভে, বিকৃত পরিপার্শ্বিকতার প্রভাবে, অর্থের প্রলোভনে এক আধজন পটুয়ার কখনওবা পদস্খলন ঘটেছে। 'বস্ত্রহরণ লীলা'র মত দু'একটি পট তাঁরা এঁকেছেন। কালীঘাট পটের সংখ্যা ও শিল্পধারায় তা একেবারে নগন্য, তুচ্ছ, উপেক্ষণীয়।

কালীঘাট পটের শ্লীলতা ও সুরুচি সম্পর্কিত আলোচনায় অনাবৃত নারীস্তন চিত্রণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া অবান্তর হলেও অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত হল :

> 'বাংলার প্রাচীন শিল্পে স্ত্রীলোকদিগের স্তন আবৃত করা হইত না। এই আব্রু বিদেশীদিগের, বিশেষভাবে মোগলদের আমদানী। রাজপুত কলাশিল্প মোগল কায়দা অবলম্বন করিয়াছিল। অজন্তা গুহার রাণীদের পর্যন্ত গাত্রে অঙ্গরক্ষা নাই, অথচ বহুমূল্য মণিমুক্তায় তাহা উজ্জ্বল। মাতৃদেহের সর্বাপেক্ষা পূণ্যস্থান, বাৎসল্যের মহাতীর্থের উপর কোন যবনিকার উৎপাত নাই। বাংলার পল্লীশিল্পে স্তন সর্বদাই নগ্ন থাকিত। সিংহল, বালীদ্বীপেও রমণীমূর্তির এই বৈশিষ্ট্য'।[১২]

উপরন্তু বাংলা দেশের নারী সম্পর্কিত যে অভিজ্ঞতা লোকচিত্রকর পটুয়াদের জীবন ঘনিষ্ঠ ছিল সে অভিজ্ঞতা অনুসারে বঙ্গনারীর উর্ধ্বাঙ্গ অনাচ্ছাদিত, 'পূত মাতৃস্তন অনাবৃত'। গ্রামবাংলার অধিকাংশ রমণীর ক্ষেত্রেই এ সত্য অবিসংবাদিত। লোকচিত্রকলা লোকজীবনের দর্পণ। কালীঘাট পটের ক্ষেত্রেও এ সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম ঘটে নি।

বিবাহ ইত্যাদি নানা সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি থেকে সুরু করে ভালুক ও বাঁদর নাচ পর্যন্ত সমাজের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ কালীঘাটের পটে চিত্ররূপ পেয়েছে।

প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামগুলি যেমন সেদিন বিপর্যস্ত হয়েছিল,

বাংলার অন্যতম লোকচিত্রকলা কালীঘাটের পটও বৌবাজার আর্ট-স্টুডিও আর জার্মান ওলীওগ্রাফের প্রকোপে এবং পশ্চিমাস্য নব্যতন্ত্রের উপেক্ষায়-অবহেলায় পর্যুদস্ত হয়েছে। কালীঘাট পটের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলশ্রুতির সম্মিলনফল বাংলা দেশের প্রায় পুরো একটি শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল।

৪

কালীঘাটের পটুয়ারা সমকালীন সমাজ জীবনের ইতিহাসে নিরপেক্ষ নিশ্চেষ্ট দর্শক নন। কালীঘাট পটের বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিই তার প্রমাণ। বিদ্রোহ-বিক্ষুব্ধ গ্রাম বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সমসাময়িক ঘটনার চিত্ররূপায়ণ, ঘনিষ্ট ব্যাপক জনসংযোগ, যাবতীয় ভণ্ডামি ও ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ধিক্কারকে অভিব্যক্ত করেই কালীঘাটের পটুয়ারা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিবাহ, কড়িখেলা, বরণডালা, ভালুকনাচ, প্রসাধন, সম্প্রদান, গোচাবণ, বধূবরণ, গাজন, ছাতনাতলায়, জলকে, সেতারবাদিনী, পদাহত, স্বামী-স্ত্রী, ভেড়া-বানানো, এলোকেশী-মহান্ত কাহিনী, নায়ক-নায়িকা, গোলাপ-সুন্দরী, বেহালাবাদিনী, , বাবু, গোঁসাই, বিড়াল, নিদ্রিতা, নর্তকী, কৃষ্ণকথাশ্রিত লোক-কাহিনী ইত্যাদি শিরোনামে পরিচিত পট কালীঘাটের পটুয়াদের বিশ্বাস ও বক্তব্যের বাহন।

কালীঘাটের পটে পাশ্চাত্য চিত্ররীতি সুলভ সূক্ষ্মরেখাপাত কিংবা নির্ভুল অবয়বচিন্তার বিচিত্র মুন্সিয়ানা নেই। কালীঘাটের পটে বিধৃত নরনারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থূল ও গোলগাল। ঘনত্বহীন 'ফ্ল্যাট' চিত্ররীতি কালীঘাট পটুয়াদের বংশ পরম্পরাগত উত্তরাধিকারে অর্জিত। একটিমাত্র রঙে 'আউটলাইন' টেনে রেখাবেষ্টিত অবয়ব ম্লান রঙের অনুলেপনে ভরাট করাই ছিল বাংলার লোকচিত্রকলা পটের অঙ্কনরীতির বৈশিষ্ট্য। এ রীতি থেকেই কালীঘাট পটে অবয়বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সীমা-ছায়া বা শেডিং দেওয়ার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়েছিল। তার ফলে কালীঘাটের পটে পুরোপুরি না হলেও প্রাণীদেহে একটা ঘনত্বের আভাস ও মণ্ডলাকৃতির ইঙ্গিত জেগে উঠল।

স্ফীতকায় নরদেহের স্থূলত্বকে কালীঘাটের পটুয়ারা বিদ্রূপের বাহন

করেছিল। এই দৈহিক স্থূলত্ব পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূন্যতার, উপহাস্য ও ঐতিহ্যভ্রষ্ট গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল হঠাৎ অবতার স্থূলরুচির প্রতীকী প্রকল্পনা। কালীঘাট পটে নারীমূর্তি স্থূলদেহী, সেখানেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গোলাকৃতি। কিন্তু যে বক্রান্তও আনম্র রেখাপাত বা 'কার্ভ' পুরুষ প্রতিমূর্তির ক্ষেত্রে আবহমান মাগধী চিত্রকলানুসৃত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের হাতিয়ার, সেই চক্রান্তি ও আনম্র রেখা নারীদেহ চিত্রণের বেলায় আনত সুষমা, বিনম্র লাবণ্য ও কমনীয় সৌন্দর্য মণ্ডনের মাধ্যম।

অনমনীয় কোণ পটে বিবর্জিত। পটুয়ার হাতে বক্রান্ত ও আনম্র রেখাবিন্যাস সতেজ ও সাবলীল। দ্রুতগতি আবর্তনে সে সতেজ রেখার সুরু ও সমাপ্তি অনায়াস-দৃষ্ট নয়। স্থূলকায় গোলাকৃতি অবযব বিন্যাসের প্রতি পটুয়াদের ঝোঁক বাংলা লোকচিত্রকলার আবহমান ঐতিহ্যানুগত। তাই কালীঘাট পটে কোণের অনুপস্থিতি ও বক্রান্ত রেখাপাতের প্রাধান্য। ফলে কালীঘাট পটেও লৌকিক ছড়ার ছন্দের মত একটি বিশেষ প্রথাগত রেখারীতি সুস্পষ্ট।

বাহুল্য বর্জিত সহজ সরল অঙ্কনরীতি কালীঘাট পটের বৈশিষ্ট্য। বৃত্তাকার মুষ্টি, হালকা অগভীর রেখায় অঙ্গুলিবিন্যাস, মোটা তুলির কালো টানে শাড়ীর পাড়, রমণীর স্তনাগ্রভাগের উপর দিয়ে বক্রান্ত রেখায় শাড়ীর আঁচলের আভাস সৃষ্টি, তৎসন্নিহিত শাড়ীর জমিতে কয়েকটি হালকা টানে সৃষ্ট বস্ত্রাঞ্চলের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া এই বাহুল্য বর্জিত সহজ সরল চিত্রকলার নিদর্শন। কপালের দুপাশে কালো রঙের প্রলেপে মেয়েদের চুল ও সিঁথির রূপরচনা কিংবা কানের পাশে ঈষৎ দক্ষিণাবর্ত কালো রঙের প্রলেপনে পুরুষের বাবরি চুল প্রদর্শিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমজাতীয় রেখার বিন্যাসগত যৎসামান্য হেরফেরে মেয়েদের দাঁড়াবার, আয়নায় মুখ দেখবার, নাচবার, কেশরচনার, বেহালা-সেতার বাজানোর যে বহু বিচিত্র ভঙ্গি স্পষ্টতা পেয়েছে, সে স্পষ্টতা কালীঘাট পটুয়াদের অসাধারণ শৈল্পিক শক্তির সাক্ষী। রাজকীয় অভিজাত্যবর্জিত স্বল্পতম রেখা এখানে সুদূর প্রসারী ইঙ্গিতে অন্তঃসত্ত্বা। রঙের সুরে ও রূপের ইঙ্গিতে কালীঘাটের পট সমকালীন সমাজমানস, লোকজীবন ও গণচিত্তকে অভিব্যক্তি দান করেছে।

কালীঘাটের পটুয়ারা তাঁদের চিত্রকলায় যে বিশেষ শিল্পদৃষ্টির পরিচয়

দিয়েছেন চিত্রকর ও চিত্রিত বিষয়ের সন্নিকট স্থিতি তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুকে তাঁরা অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছেন, দৃশ্যের সঙ্গে দ্রষ্টার ঘনিষ্ট অনুভূতির সংযোগ সাধিত হয়েছে। দৃশ্য জগতের সহজ সরল উপভোগ প্রবণতা কালীঘাট শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ।

কালীঘাটের পট বাংলার লোকসাহিত্যেব মত ছন্দপ্রধান ও আবেগোচ্ছল। বাংলার দীঘল পটের উচ্চকণ্ঠ বর্ণবৈভব নির্বিত্ত স্বল্পবৃত্ত জনসাধারণের চাহিদার চারিত্রিক তাগিদে ও যোগানের প্রাচুর্যবিধান বশত পরিত্যক্ত হযেছে। কালীঘাট পটের চিত্রণশৈলী গণতান্ত্রিক।

রঙের ব্যবহারে কালীঘাটের পটুয়ারা যে দুঃসাহসিকতায পরিচয দিয়েছেন তা পটের বহুল্যবর্জিত সহজ সরল চিত্রণশৈলীর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। সুস্থ সুন্দর উদ্‌ভাবনী শক্তি বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার পুষ্ট চিত্রসংস্কারের সোনা সোহাগা কালীঘাটের পটে সমন্বিত হযেছিল। কালীঘাটের পটুয়ারা রুচিহীন নির্লজ্জ বীভৎসতার বিরুদ্ধে লোকচিত্রকলার যে সহজ-সরল, সাবলীল-বলিষ্ঠ চিত্রণশৈলীর হাতিযারে অব্যর্থ আঘাত হেনেছিল, সেই বাহুল্য-বর্জিত চিত্রণশৈলী ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন এখনও নিঃশেষিত নয়। কালীঘাটের পট স্বল্পরেখ চিত্রণশৈলীর দুনিবাব গতিশীলতায়, সুদূরপ্রসারী ব্যাঞ্জনাসমৃদ্ধ ব্যাপকতম বক্তব্য পরিবহনের সামর্থ্যে আপন কাযকারিতাকে কালের সীমা লঙ্ঘন করে কালান্তরে পৌছে দিয়েছে।

৫

পট বাংলার লোকচিত্রকলা। দুষ্প্রাপ্য উপকরণের উৎপাত লোকচিত্রকলায় সাধারণত তিরস্কৃত। পটের ক্ষেত্রেও তাব ব্যতিক্রম হযনি। হাতে তৈরি কাগজ, আলতা, নিমের গঁদ, তেতুলের কাঁই, ডিমের খোল, বেলের আঠা, শিমুলের ছাল, বার্লি-গোলা, ছাগলের দুধ, ধুনো, তিল, ত্রিফলা, চাচ গালা, কাঠ কয়লা, হরিতাল, তুঁতে, চীনে সিঁদুর, মেটে সিঁদুর, কাঠ-খড়ি, গিরিমাটি, মীনা আর কঞ্চির গাযে পশুর লোম বেঁধে হাতে তৈরি তুলি—এই হল পটুযাদের পট আঁকার উপকরণ। কালি তৈরির নানা প্রক্রিয়া ছড়ার আকারে প্রচলিত ছিল। এ জাতীয অনেক ছড়ার একটি :

তিল ত্রিফলা সিমুল ছালা
ছাগ দুগ্ধে করি মেলা
লৌহ পাতে লোহায় ঘসি
ছিড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।

বাংলার লোকচিত্রকর পটুয়ারা কালক্রমে খনিজ রং ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁরা ভেষজ রঙের উপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতেন। নিজেদের হাতে তৈরি ভেষজ রঙে ভেজালের আশঙ্কা ছিল না। উজ্জ্বল রেখা বিন্যাসের রংগুলো সাধারণত পরিস্রুত সিরিশের সঙ্গে মিশ্রিত করা হত। প্রেক্ষার রং প্রায়শই জলের সঙ্গে মেশানো হত। সাদা চকখড়ি ছাড়া যে রঙগুলো বাংলাদেশের পটুয়ারা সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করেছেন, ভেষজ ঘননীল, সবুজ (ম্যালাসাইট), হলুদ (অরপিমেণ্ট), সিঁদুর থেকে সিঁদুরে লাল আর সোনালী। এসব রঙের সঙ্গে ছিল সিরিশ, গঁদ, মোম, মধু ইত্যাদি। কালীঘাটের পটে ভুষো কালিরই একচ্ছত্র আধিপত্য।

ফুল-পাতার রস থেকেই সচরাচর নীল রঙ তৈরি হত, আর তৈরি হত গন্ধক ও তুঁতে থিতিয়ে রেখে সেই থিতানো রঙের সঙ্গে মাড মিশিয়ে। সবুজ রঙও এমনিতর, ভেষজ। সিন্দুর থেকেই সাধারণত লাল রঙ তৈরি করা হতো। লাল গিরিমাটি থেকেও পটুয়ারা লাল রং তৈরি করতেন। লাল গিরিমাটি জলে থিতিয়ে রেখে সেই থিতানো পদার্থের রঙীন জলীয় অংশের সঙ্গে মাড় মিশিয়ে লাল রং তৈরি করার রেওয়াজ ছিল। সিরিশের সঙ্গে প্রবালচুর্ণ বা পলার গুঁড়ো মিশিয়ে জবাকুসুম সংকাশ ভোরের সূর্যের মত লাল রং তৈরি করতেন তাঁরা। হলুদ রং তৈরি হত সাধারণত গিরিমাটি আর নানান ফুল পাতার রস থেকে।

একদা পাটের কাপড়ের উপর রঙীন প্রলেপ দিয়ে পটের ক্যানভাস তৈরি করা হত। কালক্রমে কাপড়ের বদলে কাগজের ব্যবহার ব্যাপকতা পেল। হাতে তৈরি তুলট কাগজের উপরই পটুয়ারা পট আঁকতেন। কালীঘাটের পটে কাগজের ব্যবহার একচেটিয়া। হাতে তৈরি কাগজের আয়তন সব সময় সর্বাংশে এক হত না। একটু উনিশ-বিশ হওয়া স্বাভাবিক ; হতোও তাই। তাই কালীঘাটের পট আয়তনের দিক থেকে বিচিত্র। ১৭½"×, ১০½", ১৮"×১১", ১৭½"×১১½", ১৭¾"× ১১", ১৯"×১২', ১৮"×১০¾", ১৬"×১২", ১৭"×১০½", ২০"×১৩" ইত্যাদি

নানা আয়তনের বিচিত্র পট বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। পটের কাগজগুলো যন্ত্রে তৈরি হত না, যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করে কাটাও হত না। তাই কালীঘাট পটের এই আয়তনগত হেরফের।

অব্যবহার্য পাট, সুতো, ছেঁড়া কাপড-চোপড়, গাছের ছাল আর বাঁশ, এসব উপকরণ দিয়ে তৈরি হত কাগজের মণ্ড। কাগজ তৈরি একদা বাংলার অন্যতম প্রধান কুটীর শিল্প হিসাবে উৎকর্ষ ও খ্যাতি অর্জন করেছিল। এখনও বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় 'কাগজী পাডা'র অস্তিত্ব সেই অনতি অতীতের স্মারকচিহ্ন।

এসব কাগজই বাংলার পটুয়ারা তাঁদের পটে ব্যবহার করতেন। ইংরেজ আগমনের পর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের লেলিহান লোভের আগুনে বাংলার কাগজ তৈরির কুটীর শিল্প পুড়ে ছাই হল, বিলিতি কাগজে বাংলার বাজার ছেয়ে গেল, এদেশেও কাগজ তৈরির কল প্রতিষ্ঠিত হল। এসব ঘটনা ঘটবার আগে পর্যন্ত পটুয়ারা মিলের কাগজ ব্যবহার করেননি।

হাতে তৈরি তুলট কাগজ ছিল সাধারণত মোটা ও ভারী। তার বুনন ছিল মিলে তৈরি কাগজের তুলনায় অনেক শিথিল আর অমসৃণ। এসব হাতে তৈরি তুলট কাগজ সস্তা ছিল, কিন্তু খুব টেকসই ছিলনা। তুলট কাগজে আঁকা পটও তাই দীর্ঘায়ু হত না। ফলে আজ আর খুব বেশী দিনের পুরানো পট পাওয়া যায় না। অবশ্য সুষ্ঠু সংরক্ষণ প্রয়াসের অভাবও তার জন্যে বহুল পরিমাণে দায়ী।

ভেঁড়া, গরু ও ঘোড়ার লোম আর ন্যাকরার তুলি দিয়েই কালীঘাটের তথা বাংলার পটুয়ারা পট আঁকতেন। সহজলভ্য সামান্য উপকরণেই পটুযারা অসামান্য বক্তব্য উপস্থাপনের প্রত্যাশিত সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। জনগণ যেমন উন্নতর আগ্নেয়াস্ত্রের জন্যে অহেতুক অপেক্ষা না করে সহজলভ্য প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই প্রবল প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধ সুরু করে, লোকচিত্রকলার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি সহজলভ্য সামান্য উপকরণে সর্বনাশা বিকৃতি ও বীভৎস ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের সূত্রপাত। গণজীবন ঘনিষ্ঠতাই তার শক্তির উৎস, গণমানুষের প্রতি অপরিসীম আস্থাই তার বিকাশ ও বিবর্ধনের অন্যতম অবলম্বন। কালীঘাটের পট তথা বাংলার লোকচিত্রকলা মূলতঃ এই ঐতিহাসিক সত্যেরই বিশ্বস্ত দলিল।

বোলান, গাজন, টুসু, গম্ভীরা, কবিগান ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের যেমন একটি সামাজিক ভূমিকা আছে, বাংলার লোকশিল্পেরও তেমনি একটি সামাজিক ভূমিকা বিদ্যমান। বাংলার পট প্রসঙ্গে এ সত্য অবশ্য স্মর্তব্য। বৌদ্ধধর্ম প্রচারকরা পটের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন বলে তাঁরা পটকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তী কালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ তাঁদের প্রহসনের মাধ্যমে যে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে রূপায়িত করেছিলেন, কালীঘাটের পট সে সমাজ-আন্দোলনেরই রেখাচিত্র। এ সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই কালীঘাটের পট নিষিদ্ধ হয়েছিল। সামাজিক আন্দোলনে শিল্পের এ সমতাল পদক্ষেপ শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের গৌরবান্বিত নজির।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্পমাত্রেই শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার। শিল্পী যখন সামাজিক, সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব একান্ত নিশ্চিত। শ্রেণীসংগ্রামে সামিল না হয়ে শিল্পীর গত্যন্তর নেই। শিল্প শ্রেণীদ্বন্দ্বের উর্ধে—এ তত্ত্বের বর্ণচোরা তাত্ত্বিকরা বস্তুত মেহনতী জনগণের শিল্পের বিরুদ্ধে, সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বশম্বদ ভৃত্য।

শিল্পকে রাজনীতির উর্ধে স্থিত করা অসম্ভব, বিশেষত রাজনীতি যখন মূলত দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর অপরিহার্য সংগ্রাম। শিল্পের সংগ্রামও মতাদর্শের সংগ্রাম। সংগ্রামী চিত্রকলা জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের শানিত হাতিয়ার। এ জনগণই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের স্রষ্টা। শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা শ্রেণীর কথা ভুলে যাবার ওকালতি করেন তাঁরা স্বভাব বা বাস্তবের অজুহাতে কৃষক-মজুরের, মেহনতী মানুষের স্খলন-পতনের, অন্ধকার দিকের চিত্র রচনা করেন। এ নিন্দার্হ অপকর্ম আজ আর গোপন নেই।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মেহনতী মানুষের জীবনকে রূপায়িত করবার সদিচ্ছামাত্রই সার্থক শিল্প নয়। শুধু অভিলাষ নয়, শুধু ফল নয়, অভিলাষের সঙ্গে ফলের শুদ্ধ সমন্বয় সাধনই সংগ্রামী চারুকলার ক্ষেত্রে একান্ত বাঞ্ছিত। শিল্পের সঙ্গে

রাজনীতির ঐক্য একান্ত বাঞ্ছিত। প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রযুক্তির সঙ্গতি তাই প্রার্থিত। যে শিল্প বাকসর্বস্ব ভ্রষ্ট রাজনীতির মত তা অবশ্য বর্জনীয়।

বিপ্লবী শিল্পের উত্তাপ বিপ্লবী জনমত গঠনের অন্যতম উপাদান। একটি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করার জন্য মতাদর্শগত কাজকর্ম ও জনমত সৃষ্টি সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন প্রয়াসের অন্য নাম সাংস্কৃতিক বিপ্লব। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মুখ্য শক্তি। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রাচীরপত্র ও পোস্টারের গুরুত্ব কতখানি তা সাম্প্রতিক কালের চীনে সংঘটিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবে প্রমাণিত হয়েছে। চিত্রিত পোস্টারের জনপ্রিয়তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পটের কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে চিত্রকলা ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলা দেশের গণমানুষের কাছে প্রচাবের একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যানুসারী মাধ্যম। এ মাধ্যমকে মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে অনেক সুফল পাওয়া যেত। যে কাবণে ভারতবর্ষের ধিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির পৌনঃপুনিক আবর্তন ঘটেছে, বিপ্লবী সংগঠন নানাবিধ দুর্বলতাবশত, কখনও বা নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হয়নি, সে কারণেই ভাবতের তথা বাংলা দেশের লোকচিত্রকলাকে অপঘাতের হাত থেকে বাঁচানো যায় নি।

বাংলার পটুয়ারা আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে সামন্ত সমাজে সৃষ্ট চিত্রকলার রূপরীতি বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য কিনা। উত্তর ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। সে প্রাচীন রূপরীতি যখনই সংগ্রামী চিত্রকরের আয়ত্তে আসবে তখন তা নতুন আকার, নতুন অর্থ পাবে। সামন্ত প্রভুরা লোকশিল্পীদের বাধ্য করে তাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছিল, লোকশিল্পের অসামান্য শক্তিকে তাদের বিকৃত রুচির বাহনে পরিণত করেছিল। কোণারক বা পুরীর মন্দির তার প্রমাণ। সামন্ত যুগের চিত্রকলাতেও লোকচিত্রকলার উৎকর্ষ ও সামন্ত প্রভুদের রুচিবিকৃতি যুগপৎ উদ্ভাসিত। কিন্তু তার পাশাপাশি কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্তের বিপ্লবী আন্দোলনে ভারতের লোকচিত্রকলাকে নিয়োজিত করার তৎপরতা অদ্যাবধি দুর্লক্ষ্য। এ অভাব বিপ্লবী সাংস্কৃতিক-আন্দোলনের দুর্বলতার নিদর্শন।

অধুনা শিল্পের ক্ষেত্রে অহেতুক দুর্বোধ্যতা আমদানীর একটা হিড়িক পড়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতার নামে যেমন স্বাভাবিকতার অজুহাতে আমাদের জাতীয় রুচিকে বিকৃতির ক্লেদে কর্দমাক্ত করার ষড়যন্ত্র

চলছে, আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রেও সে ভুলক্ষণ দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। উপরন্তু সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রাজ্যবাদী চক্রের প্রচার যন্ত্রগুলো তার পৃষ্ঠপোষক। এসব প্রতিক্রিয়াশীল সেবাদাসরা সমস্ত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সংকীর্তন করতে করতে জনগণের স্বার্থকে মুষ্টিমেয় লোভীর স্বার্থে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মেহনতী মানুষকে শোষণ করার জন্য শাসকের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে, সেখানে কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের স্বাধীনতা থাকতে পারে না। যেখানে সামন্ত-বুর্জোয়া-সাম্রজ্যবাদী চক্রের স্বাধীনতা নির্বাধ সেখানে নিবিত্ত মজুর-চাষীর স্বাধীনতা অনিবার্যভাবে বাধাগ্রস্ত। দুই বিপরীত মেরুতে এ দুই শ্রেণীগত স্বাধীনতার অবস্থান। এ দুইয়ের নির্দ্বন্দ্ব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব।[৬৩]

জনজীবনের সামগ্রিক উন্নয়নে যাঁরা বিশ্বাসী, আমাদের লোকায়ত চিত্র-কলাকে পুনরুজ্জীবিত ও সংগঠিত করা তাঁদের আশুকৃত্য। স্বল্পতম প্রয়াসে ন্যূনতম ঋজু বলিষ্ঠ রেখায় ব্যাপ্ততম বক্তব্য অনায়াসে হৃদয়স্পর্শী করে তোলার যে অসামান্য ক্ষমতা আমাদের লোকচিত্রকলার বৈশিষ্ট্য, বিপ্লবী আন্দোলন ও মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রসারতা বিধানে তার উপযোগিতা সীমাহীন। বাংলার লোকচিত্রকলার ইতিহাস সেই সত্যের স্মারক।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হলেই কিন্তু বাংলার চিত্রকলার ভূমিকা ও কাযকারিতা শেষ হয়ে যাবে না। কারণ শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণীসংগ্রাম তিরোহিত হয় না। বিপ্লব-পরবর্তী কালে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে এবং অন্যান্য অনেক কারণে বিলাসবহুল নিরাপদ জীবনযাপনের আগ্রহ দেখা দেয় এবং বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরও প্রাক্তন শোষকশ্রেণীর মধ্যেই যে শুধু শোষণের ইচ্ছা মাথা চাড়া দেয় তা নয়, একদা বিপ্লব যাদের কাম্য ছিল, বিপ্লবের জন্য যাঁরা প্রশংসনীয় সংগ্রামে সামিল হয়েছিল তাদের মধ্যেও নানাবিধ স্খলন দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিশ্ব-ইতিহাসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী উল্লেখযোগ্য। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা নির্বিঘ্ন করার জন্যে, অটুট রাখার জন্যে, শ্রেণীসংগ্রামকে অধিকতর তীব্র ও কঠোর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হয়। তখনও চারুকলার ভূমিকা ও দায়িত্বের গুরুত্ব। উত্তরোত্তর দায়িত্ব বাড়ে বই কমে না।

যাঁরা চারুকলাকে বিপ্লবী আন্দোলনের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হিসাবে দেখেন তাঁরা নিশ্চয়ই সংগঠিত হবেন, গ্রাম ও শহরের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে সুদৃঢ়

সেতুবন্ধ রচনার কাজে এগিয়ে যাবেন। চারুকলাকে গণচরিত্র দেওয়ার জন্যেই এ মঙ্গল মিলনের প্রয়োজন। আর সংগ্রামী চিত্রকলার গণচরিত্র বিধানের জন্য চাই 'জনগণ থেকে এবং জনগণের প্রতি (from the masses and to the masses) কর্মধারায় সক্রিয় নিষ্ঠা, অবিচল বিশ্বাস। এ সত্যে সংগ্রামী চিত্রকরের অবিচল আস্থা একান্ত বাঞ্ছিত। উৎকট রঙবাজি নয়, অর্থহীন উদ্ভট রেখার বা অবয়বের হেঁয়ালী-বিলাস নয়; সহজবোধ্য, সংক্ষিপ্ত, সরল, বলিষ্ঠ প্রযুক্তির আধারে বিপ্লবী বক্তব্য উপস্থাপনাতেই লোকচিত্রকলার মুক্তি, লোকচিত্রকরের চরিতার্থতা, বলে বস্তুবাদী ছাত্র ও গবেষকবৃন্দের ধারণা।

পাদটীকা

১. সম্ভবতঃ কাপড়ের উপর ছবি আঁকাব পদ্ধতি গোড়ায় খুব বেশি ছিল, 'পট' শব্দ (পট্ট) দ্বারাই ইহা অনুমিত হয়।

—বৃহৎ বঙ্গ (১ম খণ্ড): দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ, ৪৪০।

পট···স্ত্র (সং)। চিত্রপট। (পটে—বস্ত্রে চিত্র লেখা হয় বলিযা)।

—বাঙ্গালা ভাষা (২য় ভাগ): শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, এম. এ., বিদ্যানিধি সঙ্কলিত. পৃ. ৫২৯।

'পট' কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'পট্ট' বা 'পট' কথা থেকে এবং এর অর্থ হল কাপড় বা বস্ত্রখণ্ড। প্রাচীনকালে কাপড়ের 'পর ছবি আঁকার রীতির প্রচলন ছিল এবং পট বলতে ঐ চিত্রিত বস্ত্রখণ্ডও বুঝাতো।

—বাংলার পট, পটুয়া ও পটগীতি (দেশ, মাঘ ৮, ১৩৬৪): জয়ন্ত চক্রবর্তী, পৃ. ১১৯৫।

প্রথমতঃ এই চিত্র-কাহিনী যে কাপড়ের উপর আঁকা হত তার প্রমাণ 'পট্ট' থেকে 'পট' কথাটার অপভ্রংশের মধ্যে।

—বাংলার লোকশিল্প: রথীন্দ্র মজুমদার, পৃ. ১৩।

In Bengal, the word 'Pata' signifies picture, painted on cloth or paper.

—Folk Art of Bengal : Ajit Mukherjee. P 24.

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃ. ৭৯৯) পটচিত্র শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অতএব অনুমিত হয় তিনিও উপরোক্ত ধারণার বশবর্তী।

২. ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতৌ ব্রহ্মশাপেন ব্রহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, ব্রহ্মখণ্ডম্ ১০।৯০।

৩. মালাকার কর্মকাংসশঙ্খকার কবিন্দকান।
কুম্ভকার সূত্রধার স্বর্ণচিত্রকরাংস্তথা॥
—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, ব্রহ্মখণ্ডম্, ১০।১০।

৪. সূত্রধারশ্চিত্রকারঃ স্বর্ণকারস্তথৈব চ।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদ যাজ্যা বর্ণসঙ্করাঃ॥
—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, ব্রহ্মখণ্ডম্, ১০।২১।

৫. তোর গুণধর যত কারিগর
হইবে দুঃখী বেগার।
—অন্নদামঙ্গল: ভারতচন্দ্র।

৬. ইহারা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ছিল, এজন্য অনেক স্থলেই ইহারা মুসলমান হইয়া অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছে।

—বৃহৎ বঙ্গ (১ম খণ্ড): দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৪৪১।

৭. করণচিত্তং—চরণচিত্তং চিত্তনেব চিন্তিতং…

বুদ্ধঘোষের অত্থসালিনী গ্রন্থে (৮২ পৃ.) চলন্ত চিত্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৮. নখা ব্রাহ্মণা পাসণ্ডিকা হোন্তি, পটপকোট্ঠকং কত্বা তথ নানাপ্পকারা সুগতি-দুগ্‌ গতিবসেন সম্পত্তি-বিপত্তযো লেখাপেত্বা 'ইদং কর্ম্মং কত্বা ইদং পটিলভন্তি, ইদং কত্বা ইদন্তি দস্সেত্বা তং চিত্তং গহেত্বা বিচরন্তি।

৯. শুক্রনীতি, ৪।৪. ১৫৪—৫৭

১০. এথ ব্যাগ্‌ঘা, নিবত্তবহা পচ্চমেথ মহাবনং
মা বনং ছিন্দি নিব্যঘং ব্যাঘা মা হেসু নিব্‌বনা।
—জাতক (৩য় খণ্ড): ভদন্ত আনন্দ কৌসল্যায়ন, পৃ. ৮২।

১১. জাব এদং গেহং পবিসিঅ জমপডং দংসঅন্তো গীআইং গাআমি।

কিংবা,

হংহো ব্রাহ্মণ, অত্তকেরকম্ম জেব্ব মহ ধম্মভাত্থনো ঘরং হোদি। তা দেহিমে পবেসং জাব দে উবজ্ঝাঅস্স জমপডং পসারিঅ ধম্মং উপদিসামি।

—মুদ্রারাক্ষস: বিশাখদত্ত, প্রথম অংক।

১২. পড়শ্‌শাড়ী নাডন্নাচে।
পড় লৈ গেলগৈ বোয়াল মাছে॥

১৩. আশীষ বসু তাঁর 'কালীঘাট পটচিত্রের শেষ চিত্রকর' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, 'সপ্তদশ শতাব্দীতে আদিগঙ্গার ধারে একখণ্ড জমিতে কালীঘাটের বর্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল' (অমৃত, ২৯শে চৈত্র, ১৩৬৪, পৃ. ৮০৬)। আসলে বড়িশার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের উত্তরাধিকারী সন্তোষ রায়ের অর্থানুকূল্যে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ মন্দিরের বহু সংস্কার সাধন করা হয়েছে। মন্দির-সংলগ্ন বিভিন্ন গৃহাদি প্রতিষ্ঠার বিবরণ নীচে দেওয়া হল:

প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠাকাল	প্রতিষ্ঠাতা
দুটি ভোগ-ঘর	১৮১২	গোবরুপুর নিবাসী টিকা রায়
মন্দিরের তোরণদ্বার	১৮১২	ঐ
নহবৎখানা	১৮৩৫	আন্দুলের জমিদার রাজা কাশীনাথ রায়
শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দির	১৮৪৩	বাওয়ালী নিবাসী জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল
তৃতীয় ভোগ-ঘর	১৮৪৩	শ্রীপুর নিবাসী জমিদার রায় তারকচন্দ্র চৌধুরী
চতুর্থ ভোগ-ঘর	১৮৪৪	তেলিনীপাড়া নিবাসী জমিদার কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নকুলেশ্বরের মন্দির	১৮৪৫	পাঞ্জাব নিবাসী ব্যবসায়ী তারা সিং
মন্দিরের চারদিকের রাস্তা	১৮৫৮	
শ্যামরায়ের দোলমঞ্চ	১৮৫৮	
কালীমন্দিরের প্রথম গ্যাসের আলো	১৮৭৯	ছাপরা নিবাসী গোবর্ধন দাস
কালীঘাট রোডে গ্যাসের আলো	১৮৭৯	

১৪. ...at any rate 1880, Kalighat pictures were in active production, and for reasons which presently be clear we can conclude that the school itself had probably started some twenty years earlier.

—Bazar Paintings of Calcutta : W. G, Archer, p. 6

১৫. ...the style was actually a by-product of the British connection and can only be understood against the background.

—Bazar Paintings of Calcutta : W. G. Archer, p. 6.

১৬. ইতিহাস: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৩।

১৭. ...the primary purpose of Calcutta has always been to trade, but industrial enterprises were also started and among the commodities which came to be manufactured in increasing qualities was an article of special importance for artists—paper of quality which was both cheaper and thiner than the indigenous handmade paper. Without this steady supply, the Kalighat paintings could hardly have come into existance.

—Bazar Paintings of Calcutta : W. G. Archer, pp. 6-7.

১৮. ...when Kalighat paintings first appear, in the early nineteenth century, some of there salient characteristics can only be explained as the result of British influence.

—Bazar Paintings of Calcutta : W. G. Archer, p, 8.

১৯. Seated ladies and muscians take their place beside the gods and goddesses while even more significantly, studies of fishes, snakes, birds and animals are also included...there is no evidence that these subjects had ever been treated by the patus of Bengal or were in any way a normal part of their native tradition. No ritualistic or religious considerations account for their inclusion and we must therefore assume that they entered Kalighat painting solely as a result of British example.

—Bazar Paintings of Calcutta : W. G. Archer, p. 8.

২০. পট : ১।

২১. পাহাড়পুরের বিবরণ : ডঃ চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃ. ৩০।

২২. পট—২

২৩. এও কন্যা মুকুট কুমার পছন্দ না করে।
চেরাবন্দি পট কুমার ফেলাইল দূর করে ॥...
সন্ধ্যাকালের তারা রে ভাই দুই নয়নে জ্বলে।
এও পট মুকুট রায় ফালাইল দূরে ॥...
এও কন্যা মুকুট রায় ভালা পছন্ত না করিল।
চেরাবন্দি পট রায় দূরত ফালাইল রে ॥
—মুকুট রায়, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা (৪র্থ খণ্ড : ২য় সংখ্যা) :
দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃ. ১৩৪-৩৬।

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান : পূর্ববঙ্গ-গীতিকা (২য় খণ্ড : ২য় সংখ্যা) : দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃ. ৪৪১-৩২।

মৈমনসিংহ-গীতিকা : দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃ. ৩৩২-৩৩।

২৪. বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট,
মোরা বলেছিলাম সে বড় লম্পট। —চণ্ডীদাস।

হাম সে অবলা সরলা অখলা ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি ॥ —চণ্ডীদাস।

২৫. 'স্বল্পমূল্যে বিক্রির জন্যে কালীঘাটের পট একটি বিশেষ ধরণ নেয়।...পটের যারা গ্রাহক তাদের কেনবার ক্ষমতা আর বিপুল চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে চৌকো পটের প্রচলন হয়েছিল।'—কালীঘাটের পট : ধ্রুব রায় : অমৃত, ২৯শে চৈত্র, ১৩৭৪, পৃ. ৮০৮।

ধ্রুব রায়ের এ সিদ্ধান্তের পশ্চাতে ঐতিহাসিক সত্যের সমর্থন নেই। বরং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই ইতিহাসের স্থিতি। বিভ্রান্তিকর বিদেশী-রচিত ইতিহাসের প্রতি নির্দ্বিধা আস্থা স্থাপনের ফলেই এ জাতীয় প্রমাদের উদ্ভব।

২৬. Further Excavation at Mohenjodaro ; E. Mackay, pls. Lxxxii, 1, 2 ; XCIX—A ; XVIV. প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য।

২৭. Transaction in India (1786) Younghusband, p. 131.

২৮. Gazetteer of Birbhum District. p. 16

২৯. Gazetteer of Birbhum District. p. 17.

৩০. দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ : চণ্ডীচরণ সেন, পৃ. ২৬।

৩১. Glazier's Report on Rangpur, Vol. I, p. 21.

৩২. Consideration of Indian Affairs : William Bolts, pp. 191-94.

৩৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী।

৩৪. উপসংহার : সমাজ-কুচিত্র : নিশাচর (ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

৩৫. ঐ

৩৬. হুতোম প্যাঁচার নকশা (সাহিত্য পরিষদ সং) : কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃ. ৩৮ ।
৩৭. ঐ, পৃ. ৪৬ ।
৩৮. পট—৩ ।
৩৯. পট—৪ ।
৪০. পট—৫ ।
৪১. রাধা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৪ ।
৪২. হুতোম প্যাঁচার নকশা (সাহিত্য পরিষদ সং) : কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃ ৪৪ ।
৪৩. ঐ, পৃ. ৪১ ।
৪৪. পট—৬ ।
৪৫. পট—৭ ।
৪৬. পট—৮ ।
৪৭. পট—৯ ।
৪৮. ভূমিকা : বৃহৎবঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ২॥/০
৪৯. বৃহৎবঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৪২১ ।
৫০. Chinese Art (Vol. 2) : William Willetts (1958), pp. 553-54.
৫১. বৃহৎবঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৪৪৮ ।
৫২. পট—১০ ।
৫৩. হুতোম প্যাঁচার নকশা (সাহিত্য পরিষদ সং) : কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃ. ৮৯ ।
৫৪. পট—১১ ।
৫৫. বৃহৎবঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৪৪৮ ।
৫৬. বৃহৎবঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৪৪৮ ।
৫৭. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।
৫৮. পট—১২ ।
৫৯. একেই কি বলে সভ্যতা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।
৬০. পট—১৩ ।
৬১. হুতোম প্যাঁচার নকশা (সাহিত্য পরিষদ সং) : কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃ. ৯১ ।
৬২. বৃহৎবঙ্গ : দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ৪১৭ ।

৬৩. We must firmly abide by the principle of the proletarian party spirit and combat corruption by bourgeois ideology in the following three fields i.e. the ideas guiding creation in literature and art, the organisational line and working style. We must draw a clear line between our ideology and bourgeois ideology ; we must never peacefully co-exist with it.

—The Cultural Revolution in China (Calcutta, 1966) P. 62

We must never mistake the wolf for the lamb or arsenic for sugar. We shall never be deceived by you 'tigers with smiling faces.' We must reply in kind. We must deal you destructive blows make your names reek to high heaven and defeat and overthrow you completely. We must thoroughly sweep away all 'pests' that harm the people !

—ibid, p. 95.

নির্ঘণ্ট

অধ্যায় অনুযায়ী বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি ১-২১

লোকসঙ্গীত ১-৪৩

লোকচর্যা ১-১৮

লোকচিত্রকলা ১-৪০

পট—১

হস্তী-মূষিক কথা

পট—২

কীলোৎপাটী বানর

পট—৩

পদাঘাত

পট—৪

দেহিপদ পল্লব

পট—৫

বিড়াল

পট—৬

গোঁসাই

পট—৭

যশোদা

পট ও পটের খসড়া

পট—৮

সেতারবাদিনী

পট—৯

গোলানী

পট—১০

উপেক্ষিতা

পট—১১

অশ্বারোহী

পট—১২

নর্তকী

পট—১০

ভেড়া বানানো